কুরআন ভাষান্তরের ইতিহাস ও বিবর্তন

আবদুর রহমান রাফি

কুরআন ভাষান্তরের

ইতিহাস ও বিবর্তন

বৈশ্বিক ও বাঙালি কর্মযজ্ঞের পর্যালোচনা

বিষয়সূচি

কুরআন অনুবাদের ঐতিহাসিক পথচলা

কুরআন অনুবাদের নানা ধারা: পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যের বৈচিত্র্য

বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদের ইতিহাস

বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদের পথিকৃৎ

পবিত্র কুরআন অনুবাদের চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবতা

উপসংহার

কুরআন ভাষান্তরের ইতিহাস ও বিবর্তন: বৈশ্বিক ও বাঙালি কর্মযজ্ঞের পর্যালোচনা

ভাষা একদিকে যেমন মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগের সেতুবন্ধন তৈরি করে, তেমনি কখনো কখনো তা বিভাজনের দেয়াল হিসেবেও কাজ করে। এই দ্বৈত বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছে পবিত্র কুরআন। কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য চূড়ান্ত ও চিরন্তন জীবনপথের দিকনির্দেশনা, কিন্তু এটি সমগ্র মানবজাতির ভাষায় অবতীর্ণ না হয়ে বরং এসেছে একটি নির্দিষ্ট একটি ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে—ধ্রুপদী আরবি ভাষায়।

এই পরস্পরবিরোধী বাস্তবতা থেকেই জন্ম নেয় একটি গভীর প্রশ্ন ও দায়বদ্ধতা—কীভাবে এই ঐশী বাণী বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়, যেন তারা কুরআন বুঝতে ও গ্রহণ করতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে একটি অনিবার্য পথ হলো 'কুরআনের অনুবাদ'; তবে এখানে অনুবাদ মানে কেবলই 'ভাষান্তর' নয়, বরং এটি বুদ্ধিবৃত্তিক, আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক এক জটিল অন্বেষা।

কুরআনের অনুবাদকর্মে থাকে বহুস্তরীয় চ্যালেঞ্জ। একদিকে, ধ্রুপদী আরবির ভাষাগত কাঠামো—এর শব্দের গভীরতা, বাগধারা, অলংকার ও বাক্যগঠন অনুবাদকের জন্য এক বিশাল বোধগম্যতার চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। অন্যদিকে, অনুবাদ করতে গিয়ে মূল বার্তার পবিত্রতা, ধর্মতাত্ত্বিক নির্ভুলতা ও ঐশী উদ্দেশ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখাও একটি বিশাল দায়িত্ব এবং আমানত। তার সঙ্গে যুক্ত হয় অনূদিত ভাষার সীমাবদ্ধতা ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য, যা মূল ভাবের নিখুঁত

প্রতিফলনকে আরও জটিল করে তোলে।

কুরআনের প্রতিটি অনুবাদক একরকম ‘অসম্ভব’ কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। তারা চেষ্টা করেন কুরআনের মূল ভাব, সৌন্দর্য ও গভীরতাকে অন্য ভাষায় প্রকাশ করতে। কিন্তু সেই প্রকাশ কখনোই আরবি মূলের সমতুল্য হতে পারে না। এখানেই প্রকাশ পায় কুরআনের অনুবাদের এক অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিক বাস্তবতা—কুরআনের অনুবাদ যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি অনিবার্যভাবেই অসম্পূর্ণ।

তাই কুরআনের অনুবাদ এক সূক্ষ্ম ভারসাম্যের প্রয়াস—শব্দ ও অর্থ, ভাষা ও সংস্কৃতি, বোধগম্যতা ও বিশ্বস্ততার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য খোঁজার চেষ্টা। অনুবাদক এখানে কেবল একজন দক্ষ ভাষাবিদ নন; বরং তিনি একাধারে একজন তাফসিরবিদ, সংস্কৃতিনির্ভর ভাষ্যকার এবং একজন তাকওয়াবান নিবেদিতপ্রাণ সাধক।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ সাধিত হয়েছে—প্রতিটি অনুবাদ একেকটি নতুন উপলব্ধির দ্বার উন্মোচন করেছে। এই নিবন্ধে আমরা কুরআন অনুবাদের এই বিশাল ঐতিহাসিক ধারা, এর পদ্ধতিগত রূপান্তর, অন্তর্নিহিত জটিলতা এবং এর সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার চেষ্টা করব। বিশেষভাবে দেখব বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদের ইতিহাস, এর প্রভাব, তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ এবং বর্তমান পরিস্থিতি।

কুরআন অনুবাদের ঐতিহাসিক পথচলা

কুরআন অনুবাদের ইতিহাস প্রায় ইসলামের ইতিহাসের মতোই প্রাচীন, যদিও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাকারে এর অনুবাদ আসতে এবং সেই অনুবাদের পদ্ধতিগত আলোচনা ও মান নির্ধারণের প্রক্রিয়া বিকশিত হতে কয়েক শতাব্দী সময় লেগেছে।

প্রাথমিক যুগ

ইসলামের সূচনাপর্বে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়, কুরআনের ভাবার্থ অনারব ভাষাভাষীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কিছু প্রামাণ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এসব প্রচেষ্টা মূলত নামাজ আদায়ের প্রয়োজনীয়তা, ইসলামের মৌলিক ধারণা প্রদান এবং নবীন মুসলিমদের প্রাথমিক ধর্মীয় চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে সীমিত ছিল। এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলো, সাহাবী সালমান আল-ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক পারস্যের নওমুসলিমদের জন্য সূরা আল-ফাতিহার আংশিক ফারসি ভাবার্থ বা ব্যাখ্যা প্রদান। এই প্রচেষ্টাটি একান্তই প্রয়োজননির্ভর ছিল। সালাতে সূরা ফাতিহার অর্থ বুঝে পাঠ করার লক্ষ্যেই করা হয়েছিল এই অনুবাদ। কারণ তখনো পারস্য মুসলমানরা আরবি শিখে উঠতে পারেনি। তাদের জন্য জরুরতবশত কুরআনের অনুবাদ নামাজে পাঠ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এভাবেই পারস্যবাসীর কল্যাণে কুরআনের সর্বপ্রথম ভাষান্তর সম্পন্ন হয়। সেই অনুবাদ কোনো একাডেমিক অনুবাদ ছিল না; বরং প্রাসঙ্গিক বা তাৎক্ষণিক দিকনির্দেশের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়েছিল।[1]

অন্যদিকে, ইসলাম প্রচারের প্রেক্ষাপটে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পারস্যের সম্রাট কিসরা (Chosroes)-এর নিকট প্রেরিত দাওয়াতি পত্রেও সূরা আলে ইমরানের ৬৪তম আয়াত ভাবার্থ সংযুক্ত ছিল বলে বিভিন্ন প্রামাণ্য সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। কুরআনের শিক্ষা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সেটি ছিল একটি ঐতিহাসিক আন্তঃধর্মীয় প্রয়াস।[2]

---

[1] আল-যাহাবি, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খণ্ড ১, পৃ. ৫৪০-৫৪১

[2] সহিহ আল-বুখারি: *কিসরার পত্র এবং সূরা আলে ইমরান (৩:৬৪)-এর উল্লেখ*, বাব ১, হাদিস ৭।

সহিহ মুসলিম, বাব ১৯, হাদিস ৪৩৮২।

ইসলামের আলো যখন আরব উপদ্বীপ অতিক্রম করে পারস্য, মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা ও বাইজান্টাইন অঞ্চলে পৌঁছাতে শুরু করে, তখন অনারব নওমুসলিমদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলো বোঝার জন্য নিজস্ব ভাষায় কুরআনের অর্থ জানার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে। ফলে বিভিন্ন ভূগোল ও ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কুরআনের নির্বাচিত অংশের ভাবার্থ ব্যাখ্যা, মৌখিক উপস্থাপনা কিংবা আংশিক অনুবাদ তৈরির চেষ্টা শুরু হয়।

সপ্তম শতাব্দীতে আরব মুসলিমদের উত্তর আফ্রিকায় আগমনের পর বারবাররা ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করে। তবে, কুরআনের আরবি ভাষা তাদের জন্য একটি বাধা ছিল, কারণ তাদের অধিকাংশই আরবি জানত না। এই প্রেক্ষাপটে,

---

ইবন হিশাম, *সিরাত রাসুলুল্লাহ*: নবী (ﷺ)-এর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এবং কিসরার পত্রের বিবরণ (পৃ. ৬৫২-৬৫৩)।

আল-তাবারি, *তারিখ আর-রুসুল ওয়াল মুলুক*: পত্র এবং প্রাথমিক কুরআনিক ব্যাখ্যার বিষয়ে আলোচনা (খণ্ড ৮, পৃ. ১০০-১০২)।

ইবন হাজার আল-আসকালানি, *ফাতহুল বারি*: সালমানের সূরা আল-ফাতিহার ব্যাখ্যা (খণ্ড ১, পৃ. ১৮৮)।

হামিদুল্লাহ, মুহাম্মদ. *The Life and Work of the Prophet of Islam*. ইসলামাবাদ: Islamic Research Institute, ১৯৯৮, পৃ. ১৪৫-১৪৬।

লিংস, মার্টিন. *Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources*. লন্ডন: Islamic Texts Society, ১৯৮৩, পৃ. ২৫৬-২৫৭।

আরবেরি, এ. জে. *The Koran Interpreted*. লন্ডন: George Allen & Unwin, ১৯৫৫, ভূমিকা।

আবদেল হালিম, এম. এ. এস. *The Qur'an: A New Translation*. অক্সফোর্ড: Oxford University Press, ২০০৪, ভূমিকা।

রহমান, ফজলুর. *Major Themes of the Qur'an*. শিকাগো: University of Chicago Press, ১৯৮০, পৃ. ১-২।

McAuliffe, Jane Dammen (ed.). *Encyclopaedia of the Qur'an*, Vol. 5, "Translation and the Qur'an." Leiden: Brill, ২০০৬।

কুরআনের অর্থ বোঝানোর জন্য স্থানীয় ভাষায় ব্যাখ্যা বা অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়।

ইসলাম গ্রহণের প্রাথমিক পর্যায়ে (৭ম থেকে ৮ম শতাব্দী) বারবারদের মধ্যে কুরআনের মৌখিক ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল। এই ব্যাখ্যাগুলো প্রধানত ধর্মীয় শিক্ষক বা স্থানীয় নেতাদের মাধ্যমে প্রদান করা হতো, যারা আরবি জানতেন এবং তামাজিগত ভাষায় কুরআনের আয়াতের অর্থ ব্যাখ্যা করতেন। এই প্রক্রিয়া কুরআনের আংশিক অনুবাদ বা তাফসীর (ব্যাখ্যা) হিসেবে বিবেচিত হতো।

যদিও কুরআনের পূর্ণাঙ্গ লিখিত অনুবাদ সেই সময়ে বিরল ছিল, তবু বারবার ভাষায় কিছু আংশিক অনুবাদের প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তর আফ্রিকার বারবার মুসলিমরা কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ সূরা, যেমন সূরা আল-ফাতিহা বা ছোট সূরাগুলোর অর্থ তামাজিগত ভাষায় বোঝার চেষ্টা করত। এই প্রচেষ্টাগুলো প্রধানত মৌখিক ছিল এবং ধর্মীয় শিক্ষার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এগুলোকে আনুষ্ঠানিক অনুবাদ হিসেবে গণ্য করা হতো না।[3]

ইসলামের বিস্ময়কর ও দ্রুত সম্প্রসারণ নওমুসলিমদের জন্য শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা যেমন সৃষ্টি করে, তেমনি এটি পার্শ্ববর্তী অমুসলিম ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মাঝে উদ্বেগ ও কৌতূহলও সৃষ্টি করে। এই কৌতূহল কখনো ছিল আন্তরিক, আবার কখনো তা ছিল প্রতিযোগিতামূলক ও বিরোধিতামূলক।

এই প্রেক্ষিতে কুরআনের নির্বাচিত আয়াতসমূহের অনুবাদ, সারসংক্ষেপ বা উদ্ধৃতি কখনো কখনো বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে থাকতে পারে—বিশেষত ধর্মীয় বিতর্ক, খ্রিষ্টীয় প্রতিপাদ্য রচনায় বা ইসলামকে মোকাবেলার পদ্ধতি নির্ধারণে। তবে বহু ক্ষেত্রেই এসব প্রচেষ্টার সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণ স্বল্প হওয়ায়, তা স্পষ্টভাবে প্রমাণযোগ্য নয়।

---

[3] *Encyclopaedia of the Qurʾān*, "Translation of the Qur'an," Brill Publishers, 2001-2006.

তবুও বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক যুগেই কুরআনের ভাব ও বার্তা অনুবাদের একটি প্রাথমিক বীজ রোপিত হয়েছিল, যা পরবর্তীতে বিভিন্ন সভ্যতা ও ভাষায় কুরআনের বিস্তৃত ও বিভিন্ন মাত্রিক অনুবাদের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

মধ্যযুগ ও ইউরোপে ল্যাটিন অনুবাদের সূচনা

ইউরোপীয় ভাষায় কুরআন অনুবাদের প্রাথমিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়—এ প্রচেষ্টা ইসলামকে নিরপেক্ষভাবে অনুধাবনের উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং খ্রিস্টীয় ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামকে মোকাবিলা ও খণ্ডন করার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিচালিত হয়েছিল।

এই ধারার বহুল আলোচিত, তবে বিতর্কিত মাইলফলক হলো ক্লুনির প্রকল্প ও ইংরেজ গবেষক রবার্ট অফ কেটনের অনুবাদ। দ্বাদশ শতকের স্পেন, বিশেষত টলেডো শহর সে সময় মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের জ্ঞানচর্চা এবং সংস্কৃতি আদান-প্রদানের এক উজ্জ্বল কেন্দ্র ছিল। এখানেই খ্রিস্টধর্মের প্রভাবশালী অ্যাবট পিটার দ্য ভেনারেবল, ইসলামকে 'প্রতিপক্ষ ধর্ম' হিসেবে চিহ্নিত করে কুরআনকে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করার একটি সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলামকে ভুল প্রমাণ করা এবং খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের ইসলাম-বিরোধী যুক্তি তৈরিতে সহায়তা করা।[4]

এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে রবার্ট অফ কেটন ১১৪৩ খ্রিস্টাব্দে টলেডোতেই প্রথম পূর্ণাঙ্গ লাতিন অনুবাদ সম্পন্ন করেন, যার শিরোনাম ছিল *Lex Mahumet pseudoprophete*—ভণ্ডনবী মুহাম্মদের আইন।

এই শিরোনামই অনুবাদের উদ্দেশ্য ও এর পেছনের মনোভাব স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে। রবার্টের অনুবাদ মূল আরবি পাঠের প্রতি অবিশ্বস্ত ছিল। অনুবাদটি ছিল কুরআনের সংক্ষিপ্তসার। স্থানে স্থানে ছিল ভুল ব্যাখ্যা এবং ইসলামের প্রতি গভীর বিরূপ মনোভাব। তিনি প্রায় এক-চতুর্থাংশ আরবি পাঠ বাদ দেন এবং বহু

[4] Kritzeck, James. *Peter the Venerable and Islam*. Princeton University Press, 1964.

গুরুত্বপূর্ণ আয়াতের অর্থ ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করেন।[5]

কেটনের অনুবাদের প্রায় সাত দশক পরে, আনুমানিক ১২১০ সালে, স্প্যানিশ চিকিৎসক ও ক্যানন মার্ক অফ টলেডো আরেকটি লাতিন অনুবাদ সম্পন্ন করেন। তুলনামূলকভাবে এ অনুবাদটি অধিক শুদ্ধ, পূর্ণাঙ্গ ও উন্নতমানের বলে বিবেচিত হয়েছিল। মার্ক অফ টলেডো আরবি ভাষা ও ইসলামি উৎস সম্পর্কে কেটনের চেয়ে বেশি গভীর জ্ঞান রাখতেন। তবে, তার অনুবাদটি কেটনের মতো ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।[6]

পঞ্চদশ শতকে গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার ইউরোপে জ্ঞানচর্চার এক নতুন অধ্যায় সূচিত করলেও কুরআন অনুবাদের ক্ষেত্রে এর প্রভাব ছিল ধীর এবং বিতর্কিত। রবার্ট অফ কেটনের ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয় প্রায় চার শতাব্দী পর, ১৫৪৩ সালে, সুইজারল্যান্ডের বাসেল শহর থেকে। এই প্রকাশনার সম্পাদক ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মতত্ত্ববিদ থিওডোর বিব্লিয়ান্ডার, এবং এর সাথে জড়িত ছিলেন সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবশালী নেতা মার্টিন লুথার।

লুথার বিশ্বাস করতেন, ইসলামকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে হলে কুরআনের বক্তব্য সম্পর্কে অবগত থাকা জরুরি। যদিও তিনি কেটনের অনুবাদের মান নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তবুও তিনি এর ভূমিকায় ইসলাম এবং নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে তীব্র ও আক্রমণাত্মক ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন। এই প্রকাশনা ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় অঙ্গনে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়।[7]

---

[5] Daniel, Norman. *Islam and the West: The Making of an Image*. Oneworld Publications, 1993 (পুনর্মুদ্রণ). পৃ. ৪৬-৫০.

[6] Burman, Thomas E. *Reading the Qur'an in Latin Christendom, 1140-1560*. University of Pennsylvania Press, 2007.

[7] Hamilton, Alastair. *The Forbidden Fruit: The Impact of the Qur'an in Reformation Europe*. Gingko Library, 2018.

ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদের বিস্তার

রবার্ট অফ কেটনের ত্রুটিপূর্ণ লাতিন অনুবাদ ও তার প্রভাব-বিস্তারকারী ভূমিকার মধ্য দিয়ে ইউরোপে কুরআন অনুবাদের ইতিহাসের সূচনাপর্ব শুরু হলেও, এই সময়কালেই ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় কুরআন অনুবাদের নানা প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। তবে প্রাথমিক যুগের অধিকাংশ অনুবাদ সরাসরি আরবি মূল পাঠ থেকে করা হতো না; বরং এগুলো আগের কোনো লাতিন কিংবা ইতালীয় বা ফরাসি অনুবাদকে ভিত্তি করে পরোক্ষ অনুবাদ তৈরি হতো।

এ ধরনের অনুবাদ প্রায়শই ছিল ভাষাগত ভুল, অর্থবিকৃতি এবং গভীর ইসলামবিরোধী মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত। কুরআনের প্রকৃত বার্তা এ অনুবাদগুলোতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো, এবং এর মাধ্যমে ইউরোপে ইসলাম সম্পর্কে নানা ধরনের কুসংস্কার ও নেতিবাচক ধ্যানধারণার বিস্তার ঘটে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরবি ভাষা চর্চা ইউরোপে বাড়তে শুরু করে এবং এর ফলে সরাসরি আরবি থেকে অনুবাদের একটি ধারা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।

১৫৪৭ সালে আন্দ্রেয়া আরিভাবেনে, ভেনিসে বসে রবার্ট অফ কেটনের লাতিন অনুবাদ অবলম্বনে প্রথম মুদ্রিত ইতালীয় অনুবাদ প্রকাশ করেন, যার শিরোনাম ছিল *L'Alcorano di Macometto*। এই অনুবাদটিও মূল আরবি থেকে অনেক দূরে ছিল এবং ইসলাম সম্পর্কে গভীর বিকৃত ধারণা উপস্থাপন করেছিল।

এর প্রায় সাত দশক পর, ১৬১৬ সালে, প্রটেস্ট্যান্ট যাজক সালোমন শোয়েগার জার্মানির নুরেমবার্গে আরিভাবেনের ইতালীয় অনুবাদ অবলম্বনে প্রথম জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন—*Alcoranus Mahometicus* নামে। এই অনুবাদও ছিল পরোক্ষ এবং এটি ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণাকে আরও সংহত করে তোলে।

১৬৪১ সালে, শোয়েগারের জার্মান অনুবাদ থেকে একটি বেনামী ডাচ অনুবাদ হামবুর্গ থেকে প্রকাশিত হয়। ইউরোপে এটি ছিল কুরআনের প্রথম ডাচ অনুবাদ,

যদিও সেটিও একটি পরোক্ষ উৎসের ভিত্তিতে তৈরি হওয়ায় সেটির মান ও নির্ভুলতা ছিল সীমিত।

এই প্রেক্ষাপটে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে ফ্রান্সের কূটনীতিক ও প্রাচ্যবিদ আন্দ্রে ডু রায়ার-এর হাতে। তিনি মিশর ও ইস্তাম্বুলে ফরাসি কনসাল হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে সরাসরি আরবি ভাষা শিক্ষার সুযোগ পান। তার অনুবাদ, *L'Alcoran de Mahomet*, ১৬৪৭ সালে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় এবং এটি ছিল সরাসরি আরবি থেকে ফরাসি ভাষায় সম্পন্ন প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ।

ডু রায়ারের অনুবাদ আগের পরোক্ষ অনুবাদগুলোর তুলনায় অধিক নির্ভুল ও নিরপেক্ষ হলেও, এতে কিছু ভাষাগত ভুল ও সীমাবদ্ধতা রয়ে যায়। তবু এটি এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়, এবং পরবর্তী এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এটি ইউরোপে কুরআনের প্রধান ফরাসি সংস্করণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এমনকি এই অনুবাদটি ইংরেজি ও ডাচসহ অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদের ভিত্তি হিসেবেও কাজ করে।

১৬৪৯ সালে আলেকজান্ডার রস, ডু রায়ারের ফরাসি অনুবাদ থেকে ইংরেজি ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন—*The Alcoran of Mahomet* নামে। রস নিজে আরবি ভাষা জানতেন না, ফলে তার অনুবাদ ছিল অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ এবং ইসলাম সম্পর্কে প্রবল বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্যে পরিপূর্ণ। তিনি তার দীর্ঘ ভূমিকায় ইসলাম ও নবী মুহাম্মদের প্রতি চরম আক্রমণাত্মক ও অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার করেন, যা অনুবাদের উদ্দেশ্য ও ইউরোপীয় মনোভাবকে স্পষ্ট করে তোলে।[8]

এই ধারার মধ্যেও এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম ও অগ্রসর প্রয়াস ছিল জর্জ সেল-এর অনুবাদ। তিনি ব্রিটিশ আইনজীবী হলেও প্রাচ্যবিদ্যা ও আরবি ভাষার প্রতি তার

[8] Ross, Alexander. *The Alcoran of Mahomet.* London, 1649. (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি ১৭৩৪ সালে *The Koran, Commonly Called the Alcoran of Mohammed* নামে একটি সরাসরি আরবি থেকে ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন।

সেল-এর অনুবাদ ছিল পূর্ববর্তী অনুবাদগুলোর তুলনায় অনেক বেশি নির্ভুল, প্রাঞ্জল ও তুলনামূলকভাবে সহানুভূতিশীল। এর সাথে তিনি সংযুক্ত করেন একটি বিশদ 'Preliminary Discourse', যেখানে ইসলাম, কুরআনের গঠন, মুসলমানদের বিশ্বাস, ইতিহাস, আরবদের জাহেলি যুগ এবং তৎকালীন মুসলিম সমাজের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। এটি ইউরোপে ইসলামের প্রাথমিক ও তুলনামূলকভাবে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

যদিও পরবর্তীতে সেলের অনুবাদমূলক কাজের উদ্দেশ্য—বিশেষত মিশনারি কিংবা ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্য ছিল কি না—তা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, তবু এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এই অনুবাদ পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরে ইংরেজিভাষী বিশ্বে কুরআনের সবচেয়ে পরিচিত, পঠিত এবং প্রভাবশালী সংস্করণে পরিণত হয় এবং বহুবার পুনর্মুদ্রিত হয়।[9]

মুসলিম বিশ্বে কুরআনের অনুবাদ

মুসলিম বিশ্বের অনুবাদচর্চা ইউরোপীয় ধারার চেয়ে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ইউরোপে কুরআন অনুবাদের সূচনা হয়েছিল প্রধানত ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক, খণ্ডন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। অন্যদিকে মুসলিম বিশ্বে কুরআনের অনুবাদকর্ম সাধিত হয়েছিল মূলত ধর্মীয় জ্ঞানার্জন, শিক্ষাবিস্তার, আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ এবং ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার মহান উদ্দেশ্যে। এ ধারার মূলে ছিল আল্লাহর কালামের সর্বজনীনতা ও মানুষের কাছে সহজবোধ্যতায় কুরআনের নির্দেশনা পৌঁছে দেওয়ার আন্তরিক প্রয়াস।

---

[9] Sale, George. *The Koran*. London, 1734. (বিশেষত 'Preliminary Discourse')

মুসলিম বিশ্বে কুরআনের প্রথম, সর্বাধিক এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী অনুবাদগুলো হয়েছে ফারসি ভাষায়। এর পেছনে একাধিক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কারণ বিদ্যমান। ইসলামি জ্ঞানচর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পারস্যের ভূমিকা ছিল। এছাড়াও ফারসি ভাষার গভীর প্রভাব ছিল মুসলিম প্রশাসন, সাহিত্য, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার বিস্তারে। এসব বহুমাত্রিক কারণ ফারসিকে একটি প্রাকৃতিক অনুবাদমাধ্যমে রূপান্তরিত করেছিল। পাশাপাশি, আরবি ভাষার সঙ্গে ফারসির শব্দতাত্ত্বিক ও ধ্বনিগত ঘনিষ্ঠতাও অনুবাদ প্রক্রিয়াকে সহজতর করেছিল।

ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে পারস্য অঞ্চলে (বর্তমান ইরান ও মধ্য এশিয়ার অংশবিশেষ) বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলাম গ্রহণের হার বৃদ্ধি পায়। এই ফারসি ভাষাভাষী নওমুসলিমদের জন্য পবিত্র কুরআনের বাণী বোঝা এবং এর শিক্ষা অনুসরণ করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী সামানিদ সাম্রাজ্যের (৮১৯-৯৯৯ খ্রি.) শাসনামলেই কুরআনের প্রথম উল্লেখযোগ্য ফারসি অনুবাদের সূচনা ঘটে।

কুরআনের ফারসি অনুবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হলো বিখ্যাত মুফাসসির আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারির আত-তাবারি (৮৩৯-৯২৩ খ্রি.) রচিত তাফসির ‘জামিউল বায়ান আন তাবিলি আয়িল কুরআন’, যা ‘তাফসির আত-তাবারি’ নামে সমধিক পরিচিত, তার ফারসি অনুবাদ। মূল আরবি তাফসিরটি কুরআনের আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, প্রাসঙ্গিক হাদিস, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং আইনগত বিশ্লেষণের এক বিশাল সংগ্রহ। সামানিদ শাসক প্রথম মনসুর ইবনে নুহের (শাসনকাল: ৯৬১-৯৭৬ খ্রি.) নির্দেশে ট্রান্সঅক্সিয়ানার একদল বিশিষ্ট আলেম বুখারায় এই তাফসিরটির ফারসি অনুবাদ সম্পন্ন করেন। যদিও এটি কুরআনের মূলানুগ অনুবাদ ছিল না, প্রতিটি আয়াতের অনুবাদের সাথে এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা যুক্ত থাকায় এটি একটি পূর্ণাঙ্গ তাফসিরের মর্যাদা লাভ করে। এই অনুবাদটি কেবল ফারসি গদ্য সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনগুলোর মধ্যেই অন্যতম নয়, বরং এটি ফারসি

ভাষাভাষী মুসলিমদের মধ্যে কুরআনের শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে এবং ফারসি ভাষাকে ধর্মীয় ও সাহিত্যিক চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

সামানিদ যুগের পর থেকে ফারসি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসির রচনার ধারা অব্যাহত থাকে এবং সময়ের সাথে সাথে তা আরও সমৃদ্ধ হয়। বিভিন্ন রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা এবং আলেম ও গবেষকদের নিরলস প্রচেষ্টায় ফারসি তাফসিরের এক শক্তিশালী ঐতিহ্য গড়ে ওঠে।

গজনবি (৯৭৫-১১৮৭ খ্রি.) এবং সেলজুক (১০৩৭-১১৯৪ খ্রি.) শাসনামলে ফারসি ভাষা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হিসেবে আরও বিকশিত হয়। এই সময়ে কুরআনের সরাসরি অনুবাদের চেয়ে ফারসি ভাষায় তাফসির বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ যুগের উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে তাফসির-ই কাশিফ এবং অন্যান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে সহজ-সরল ফারসি ভাষায় রচিত হয়েছিল।

মোঙ্গল ইলখানি (১২৫৬-১৩৫৩ খ্রি.) এবং পরবর্তীতে তৈমুরি (১৩৭০-১৫০৭ খ্রি.) শাসনামলে ফারসি ভাষায় কুরআনের তাফসির রচনা আরও গভীরতা ও পাণ্ডিত্য লাভ করে। এই সময়ে সুফি দর্শনের ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়, যার ফলে তাফসিরগুলোতে আয়াতের আক্ষরিক অর্থের পাশাপাশি রূপক, আধ্যাত্মিক ও রহস্যবাদী ব্যাখ্যার প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। তাফসির-ই নাসাফি এবং তাফসির-ই বায়দাভির ফারসি সংস্করণ এ সময়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে, যেখানে কুরআনের আয়াতের গভীর দার্শনিক তাৎপর্য উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে।

সাফাভি সাম্রাজ্য (১৫০১-১৭৩৬ খ্রি.) ইরানে শিয়া মতবাদকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে। এটি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকেও প্রভাবিত করে। এ যুগে রচিত কুরআনের ফারসি তাফসিরগুলোতে শিয়া ধর্মতত্ত্বের প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য

করা যায়। মোল্লা ফতহুল্লাহ কাশানির ‘তাফসির-ই মিনহাজ আস-সাদিকিন’ এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ, যা শিয়া দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত হলেও এর সাবলীল ভাষা ও পরিশীলিত গদ্যশৈলীর জন্য ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়।

আধুনিক যুগে এসে, বিশেষ করে মুদ্রণযন্ত্রের প্রসার ও শিক্ষার হার বৃদ্ধির ফলে, কুরআনের সরাসরি ফারসি অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায় এবং এর প্রচলন বাড়ে। অনেক আলেম ও গবেষক এই কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আয়াতুল্লাহ নাসির মাকারিম শিরাজি রচিত ‘তাফসির-ই নামুনা’ আধুনিক ফারসি ভাষায় রচিত একটি জনপ্রিয় তাফসির, যা সাধারণ পাঠকের জন্য কুরআনের বার্তা সহজবোধ্য করে তুলেছে। ১৯৭৯ সালের ইরানের ইসলামি বিপ্লবের পর কুরআনের ফারসি অনুবাদ, গবেষণা ও তাফসির প্রকাশের কাজে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়েছে।

কুরআনের ফারসি অনুবাদ ও তাফসিরগুলো কেবল ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে গভীর প্রভাব ফেলেছে তাই নয়, এগুলো ফারসি গদ্য ও কাব্যের মানোন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সামানিদ যুগে যে অনুবাদ ধারার সূচনা হয়েছিল, তা ফারসি ভাষাকে ইসলামি বিশ্বের অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক ও ধর্মীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হয়েছে। পাশাপাশি, এই তাফসিরগুলো বিভিন্ন সময়ে সুফি দর্শন ও শিয়া ধর্মতত্ত্বের বিকাশ ও প্রসারেও ভূমিকা রেখেছে এবং ফারসি ভাষাভাষী মুসলিমদের মধ্যে কুরআনের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক বোঝাপড়াকে আরও গভীর ও সমৃদ্ধ করেছে।[10]

---

[10] Frye, R. N. (1975). *The Cambridge History of Iran, Vol. 4: The Period from the Arab Invasion to the Saljuqs*. Cambridge University Press.
Bosworth, C. E. (1996). *The New Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Manual*. Edinburgh University Press.
Meisami, J. S. (1999). *Persian Historiography to the End of the Twelfth Century*. Edinburgh University Press.
Arjomand, S. A. (1984). *The Shadow of God and the Hidden Imam: Religion, Political Order, and Societal Change in Shi‘ite Iran from the Beginning to 1890*.

ভারতীয় উপমহাদেশে দীর্ঘদিন ফারসি শিক্ষিত মুসলিম সমাজের প্রধান ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সেই প্রেক্ষাপটে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আলেম, মুজাদ্দিদ ও সমাজসংস্কারক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (১৭০৩–১৭৬২ খ্রি.) ফারসি ভাষায় কুরআনের একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী অনুবাদ রচনা করেন—'ফাতহুর রাহমান ফি তারজামাতিল কুরআন' (প্রায় ১৭৩৮ খ্রি.) নামে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষিত সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে কুরআনের মূল বার্তা সহজভাবে পৌঁছে দেওয়া এবং প্রচলিত কুসংস্কার ও বিভ্রান্তি দূর করা।[11]

এই অনুবাদ পরবর্তীতে তার সুযোগ্য পুত্রদের দ্বারা উর্দুতে ভাষান্তরিত হয় এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামি পুনর্জাগরণ ও কুরআন-ভিত্তিক চিন্তাধারার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

উপমহাদেশে উর্দু ভাষার বিকাশের সাথে সাথে মুসলিমদের মধ্যে কুরআন অনুবাদে উর্দুর প্রভাব বাড়তে থাকে। শাহ ওয়ালিউল্লাহর পুত্র শাহ আব্দুল কাদির দেহলভী (১৭৫৩–১৮১৪ খ্রি.) রচনা করেন কুরআনের প্রথম প্রাঞ্জল ও জনপ্রিয় উর্দু অনুবাদ—মুযিহুল কুরআন। এটি ভাবানুবাদ হলেও ছিল সহজবোধ্য ও সাধারণ মানুষের জন্য উপযোগী। অপর পুত্র শাহ রফিউদ্দিন দেহলভী (১৭৫০–১৮৩৩ খ্রি.) শব্দে-শব্দে কুরআনের একটি আক্ষরিক উর্দু অনুবাদ সম্পন্ন করেন। এই দুই অনুবাদ উর্দু ভাষায় কুরআন বোঝার ভিত্তি স্থাপন করে এবং পরবর্তী শতকে অসংখ্য অনুবাদ ও তাফসির রচনার পথ উন্মুক্ত করে।[12]

পরবর্তীতে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (বয়ানুল কুরআন), মাওলানা

University of Chicago Press.
Rippin, A. (Ed.). (2006). *The Blackwell Companion to the Qur'an*. Blackwell Publishing.

[11] Hermansen, Marcia K. *Shah Wali Allah of Delhi's Hujjat Allah al-Baligha*. Fons Vitae, 2014. (ভূমিকা)

[12] Powell, Avril A. *Muslims and Missionaries in Pre-Mutiny India*. Routledge, 1993. পৃ. ১৪৫-১৪৭.

আবুল আ'লা মওদুদী (তাফহীমুল কুরআন), আহমদ রেজা খান বেরলভী (কানযুল ঈমান), মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী, পীর করম শাহ আল-আযহারী (জিয়াউল কুরআন) প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও মনীষীর অনুবাদ ও তাফসির উর্দু ভাষায় অত্যন্ত প্রভাবশালী হয় এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। এসব অনুবাদ ও তাফসির আজও লক্ষ লক্ষ মানুষ পাঠ করেন।

উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সাথে তুর্কি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসির রচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রাথমিকভাবে আলেমদের মধ্যে অনারবি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ নিয়ে কিছু দ্বিধা থাকলেও, প্রশাসনিক বাস্তবতা ও সাধারণ জনগণের চাহিদা সেই দ্বিধা ভেঙে দেয়। পরবর্তীকালে দিয়ানেত (ধর্ম বিষয়ক অধিদপ্তর) ও অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বহু অনুবাদ প্রণয়ন করা হয়।

তুরস্ক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে, ১৯২৪ সালের কাছাকাছি সময়ে, তুর্কি ভাষায় কুরআনের কিছু প্রাথমিক অনুবাদ প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই অনুবাদ উদ্যোগগুলোর সূচনা উসমানীয় সাম্রাজ্যের শেষ পর্যায়ে হলেও, নতুন প্রজাতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির কাঠামোর মধ্যে এগুলো একটি ভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট লাভ করে। কর্নেল সেমিল সাইদসহ কয়েকজন গবেষক এই সময়ের অনুবাদ কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন। এই অনুবাদগুলো ছিল তুর্কি জনসাধারণের জন্য আরবি কুরআনের অর্থ উপলব্ধ করার প্রাথমিক ও ব্যাপক প্রচেষ্টা।

এই ধারাবাহিকতায়, ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে এলমালিলি মুহাম্মেদ হামদি ইয়াজিরের রচিত ‘হাক্ক দিনি কুরআন দিলি’ প্রকাশিত হয়। এটি ছিল তুর্কি ভাষায় প্রথম আধুনিক এবং ব্যাপকভাবে স্বীকৃত কুরআনের অনুবাদ ও তাফসির। মাতুরিদি মাযহাবের অনুসারী গবেষক মুহাম্মেদ হামদি ইয়াজির মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের নির্দেশনা এবং তুর্কি গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির আর্থিক সহায়তায় এই কাজটি সম্পন্ন করেন। নয় খণ্ডে প্রকাশিত এই তাফসিরের মূল লক্ষ্য ছিল

ধর্মীয় জ্ঞানকে তুর্কি জনগণের কাছে তাদের মাতৃভাষায় সহজলভ্য করে তোলা। এটি তুর্কি ভাষায় কুরআনের প্রথম সম্পূর্ণ তাফসির হিসেবে বিবেচিত হয় এবং আজও তুরস্কের ধর্মীয় সাহিত্যে এর ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান। এই কাজটি তুর্কি ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞানকে স্থানীয়করণ করে আরবি ভাষার ঐতিহাসিক প্রভাব হ্রাস করার পাশাপাশি তুর্কি জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

ঐতিহাসিকভাবে পর্যবেক্ষণ করলে, ১৯০০ সালের পর তুর্কি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ছিল তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদী এজেন্ডার একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান। ১৯২৪ সালে খিলাফত বিলুপ্তি, ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া এবং সুফি তরিকাগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের মতো পদক্ষেপের পাশাপাশি, এই অনুবাদগুলো ছিল ধর্মীয় জ্ঞান ও প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার একটি কৌশল। এর উদ্দেশ্য ছিল আরবিকেন্দ্রিক ধর্মীয় কাঠামোর প্রভাব কমিয়ে তুর্কি ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী জাতীয় পরিচয় নির্মাণ করা। উল্লেখ্য, এই অনুবাদ কার্যক্রমগুলো তীব্র বিতর্কের জন্ম দেয়। মুহাম্মদ রশিদ রিদার মতো রক্ষণশীল আলেমরা এটিকে আরবি কুরআনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করেন, অন্যদিকে আধুনিকতাবাদীরা এটিকে ধর্মীয় জ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখেন।[13]

---

[13] Wilson, M. Brett. “The First Translations of the Qurʾan in Modern Turkey (1924–38).” *International Journal of Middle East Studies*, vol. 41, no. 3, 2009, pp. 419–435.

Findley, Carter V. *Turkey, Islam, Nationalism, and Modernity: A History, 1789-2007*. Yale University Press, 2010, p. 250.

Hughes, Micah. “Making the Qurʾan Turkish: Translation and Power in the Ottoman Empire.” *The Marginalia Review of Books*, 2016.

Wilson, M. Brett. *The Qur'an after Babel: Translating and Printing the Qur'an in Late Ottoman and Modern Turkey*. Dissertation, Duke University, 2009.

কুরআন অনুবাদের নানা ধারা: পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যের বৈচিত্র্য

পবিত্র কুরআনের অনুবাদকর্মের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বিভিন্ন পদ্ধতি ও ধারার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। অনুবাদকের দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মতাত্ত্বিক অবস্থান, মূল আরবি পাঠের প্রতি তার বোঝাপড়া এবং লক্ষ্য ভাষার প্রকৃতি ও সাংস্কৃতিক পটভূমির ভিন্নতার কারণে এই বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। অনুবাদের উদ্দেশ্য ও প্রয়োগভেদে এসব ধারার বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হয়। নিম্নে কুরআন অনুবাদের প্রধান ও বহুল প্রচলিত কয়েকটি ধারা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. আক্ষরিক অনুবাদ

(Literal/Word-for-word/Formal Equivalence Translation)

এই পদ্ধতিতে অনুবাদক মূল আরবি শব্দের সাথে সর্বাধিক শাব্দিক বিশ্বস্ততা বজায় রেখে লক্ষ্য ভাষায় প্রতিশব্দ ব্যবহারের চেষ্টা করেন। মূল পাঠের বাক্য গঠন, শব্দক্রম এবং রচনাশৈলীকে যতটা সম্ভব অপরিবর্তিত রাখাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে পাঠক মূল আরবি পাঠের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন।

তবে এর প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো, লক্ষ্য ভাষার স্বাভাবিক গতি ও প্রাঞ্জলতা এতে প্রায়শই বিঘ্নিত হয়। আরবি ভাষার নিজস্ব অলঙ্কার, রূপক ও জটিল ব্যাকরণগত কাঠামো (যেমন পূর্বাপর প্রসঙ্গ নির্ভর সর্বনামের সূক্ষ্ম ব্যবহার) অন্যান্য ভাষায় হুবহু স্থানান্তরিত করা কঠিন হওয়ায় অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট বা ভুল বোঝাবুঝির কারণ হতে পারে।

এই ধারার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো শাহ রফিউদ্দিন দেহলভীর উর্দু অনুবাদ।

২. ভাবানুবাদ বা তাফসিরি অনুবাদ

(Meaning-based/Explanatory/Dynamic Equivalence Translation)

এই ধারায় অনুবাদক শব্দের আক্ষরিক অর্থের চেয়ে আয়াতের সামগ্রিক ভাব, মূল বার্তা এবং শিক্ষাকে সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপনের উপর জোর দেন। লক্ষ্য ভাষার নিজস্ব রীতি অনুযায়ী প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভঙ্গিতে মূল ভাব প্রকাশ করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। পাঠকের সুবিধার জন্য অনেক সময় অনুবাদে ব্যাখ্যামূলক অংশ বা প্রাসঙ্গিক তথ্য বন্ধনীতে বা পাদটীকায় যুক্ত করা হয়, যা অনুবাদ ও তাফসিরের একটি সমন্বিত রূপ।

এই পদ্ধতির সুবিধা হলো এটি সাধারণ পাঠকের জন্য অত্যন্ত সহজগম্য ও হৃদয়গ্রাহী হয় এবং ভাষার স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় থাকে। এর মাধ্যমে কুরআনের মূল শিক্ষা অনুধাবন সহজ হয়।

তবে অনুবাদকের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা, ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাস বা মাযহাবগত প্রবণতার কারণে মূল অর্থের কিছুটা বিচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা এখানে থাকে। তাই অনুবাদকের গভীর জ্ঞান, সততা ও আল্লাহভীতি এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বজুড়ে বহু জনপ্রিয় অনুবাদ এই ধারার অন্তর্ভুক্ত। এই ধারায় অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনুবাদকদের মধ্যে রয়েছেন—আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী, মারমাডিউক পিকথল, এম.এ.এস. আব্দুল হালিম (ইংরেজিতে); শাহ আবদুল কাদির দেহলভী (উর্দুতে); এবং মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (বাংলায়)।

৩. একাডেমিক অনুবাদ

(Scholarly/Academic Translation)

এই ধারাটি মূলত গবেষক এবং উন্নত পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত। এতে কেবল অনুবাদই নয়, বরং মূল আরবি পাঠের ভাষাতাত্ত্বিক (ব্যুৎপত্তি, ব্যাকরণ, অলঙ্কার), ঐতিহাসিক (আসবাবুন-নুযুল, সমাজ প্রেক্ষাপট) এবং ব্যাখ্যাগত বিশ্লেষণের উপর গভীর জোর দেওয়া হয়। বিভিন্ন কিরাআত (পাঠরীতি),

মুফাসসিরগণের ব্যাখ্যার তুলনামূলক আলোচনা, বিস্তারিত টীকা-টিপ্পনী ও সমৃদ্ধ গ্রন্থপঞ্জি সাধারণত এই ধরনের অনুবাদের অংশ থাকে।

এর মূল লক্ষ্য হলো কুরআনের পাঠ, ভাষা ও ভাবের বহুমাত্রিক দিকগুলো এবং ব্যাখ্যাগত দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা পাঠকের সামনে উন্মোচন করা। কুরআন গবেষণার জন্য এই প্রকারের অনুবাদ মূল্যবান উৎস হিসেবে গৃহীত হয়।

তবে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণের প্রাধান্যের কারণে এর ভাষা সাধারণ পাঠকের কাছে কিছুটা জটিল বা কম প্রাঞ্জল মনে হতে পারে।

এই ধারার আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত উদাহরণ হলো জর্জ সেলের এবং আর্থার জন আর্বেরি (A. J. Arberry)-এর ইংরেজি অনুবাদ।

৪. নির্দিষ্ট মাযহাব বা মতাদর্শভিত্তিক অনুবাদ

(Madhhab-based or Ideological Translations)

অনুবাদকের নিজস্ব ধর্মীয় মাযহাব বা মতাদর্শ কখনো কখনো পবিত্র কুরআনের অনুবাদকর্মকে প্রভাবিত করতে পারে। কুরআনে এমন বহু আয়াত রয়েছে, যেগুলোর তাৎপর্যে একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে, কিংবা যেসব আয়াতে আকিদা ও ফিকহ-সংক্রান্ত সূক্ষ্ম তাত্ত্বিকতা নিহিত থাকে। এসব ক্ষেত্রে অনুবাদকের নিজস্ব মাযহাব—যেমন হানাফি, শাফিঈ, মালিকি, হাম্বলি—অথবা আকিদাগত ঘরানা—যেমন আহলুস সুন্নাহ, শিয়া, সালাফি, সুফি প্রভৃতি—তার অনুবাদে ভাষা, শব্দচয়ন, ভাবার্থ, এমনকি পাদটীকায় ব্যবহৃত ব্যাখ্যাগত দৃষ্টিভঙ্গিকে সুস্পষ্টভাবে প্রভাবিত করে। কখনো এই প্রভাব উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নির্দিষ্ট মতাদর্শ প্রচারের আকাঙ্ক্ষা থেকে আসে, আবার কখনো অনুবাদকের ব্যক্তিগত ধর্মীয় অনুশীলন ও দীর্ঘদিনের তাত্ত্বিক শিক্ষার প্রভাবে তা অনিচ্ছাকৃতভাবেই অনুবাদে প্রতিফলিত হয়।

এ ধরনের প্রভাব অনুবাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয়, বিশেষত তাওহিদ, সিফাতুল্লাহ, নবুয়ত, সাহাবা ও আহলুল বাইতের মর্যাদা, শাফাআত, তাকদীর,

ও ফিকহি বিধানের ক্ষেত্রে। যেমন, আল্লাহ তাআলার গুণাবলির বিষয়ে আয়াত—'ইয়াদুল্লাহ', 'ওয়াজহুল্লাহ', 'ইসতাওয়া আলাল আরশ—ইত্যাদি অনুবাদে কেউ গ্রহণ করেন আক্ষরিক অর্থ, আবার কেউ রূপক বা তাওয়ীলভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যা তাদের আকিদাগত অবস্থানেরই প্রতিফলন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা, সাহাবাগণের অবস্থান, আহলুল বাইতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং শাফাআত সংক্রান্ত আয়াতসমূহেও অনুবাদকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুবাদের ভাষা ও ব্যাখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

তদ্রূপ, ফিকহি বিধান সম্পর্কিত আয়াতসমূহ—যেমন তহারাত, সালাত, সাওম, হজ্জ, বিবাহ, তালাক, মিরাস ইত্যাদি—অনুবাদেও অনুবাদক নিজের অনুসৃত মাযহাবের ফিকহি ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এর ফলে ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবভিত্তিক অনুবাদে আয়াতের অনুবাদগত রূপ ও ব্যাখ্যা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পাদটীকায় তিনি প্রায়শই নিজ মাযহাবের সিদ্ধান্তকে নিরঙ্কুশভাবে উপস্থাপন করেন, যা অন্যান্য মতাদর্শের অনুসারীদের জন্য এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে।

তাছাড়া, ঐতিহাসিক বর্ণনা ও পূর্ববর্তী উম্মতের ঘটনাবলী অথবা ইসলামের সূচনালগ্নের ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনায়ও অনুবাদক তার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক অবস্থান অনুযায়ী ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যা প্রায়ই নিরপেক্ষতার সীমা ছাড়িয়ে নিজস্ব মতাদর্শে রঞ্জিত হয়ে ওঠে।

এইরূপ অনুবাদ একদিক থেকে বিশিষ্ট ও মূল্যবান; কারণ তা সংশ্লিষ্ট মতাবলম্বী পাঠকের জন্য পরিচিত ও সুসংগত ব্যাখ্যার মাধ্যমে কুরআনের বাণীকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। তাদের আকিদা ও ফিকহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুবাদ পাঠে তাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা আসে। তবে অন্যদিকে, যারা কুরআনের বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা অন্বেষণ করতে চান, কিংবা তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাপদ্ধতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, তাদের জন্য এই অনুবাদগুলো কিছুটা সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারে। সেজন্য এ ধরনের অনুবাদ পাঠের পাশাপাশি

বিভিন্ন মতাদর্শভিত্তিক অনুবাদ ও স্বীকৃত তাফসিরসমূহ অধ্যয়ন করা জ্ঞানান্বেষণের জন্য অপরিহার্য।

বিশ্বজুড়ে মাযহাবভিত্তিক অনুবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অনুবাদ হলো: আল্লামা আহমদ রেজা খান বেরলভী রচিত উর্দু অনুবাদ 'কানযুল ঈমান'—যা হানাফি ফিকহ ও বেরলভী আকিদার নিরিখে প্রণীত, বিশেষত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা সম্পর্কিত আয়াতসমূহে অনন্য ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ও ব্যাখ্যা প্রদর্শন করে। অপরদিকে, শিয়া দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রণীত একটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদ হলো আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজীর তাফসিরে নমুনা—যেখানে শিয়া আকিদা, ইমামত, আহলুল বাইতের মর্যাদা এবং জাফরিয়া ফিকহের ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদের ইতিহাস

বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদের যাত্রা খুব প্রাচীন না হলেও, এর ইতিহাস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, জটিল এবং গভীর অর্থবহ। উনিশ শতকের শেষভাগে এই অনুবাদ-চর্চার সূচনা হলেও এর অন্তর্নিহিত প্রেরণা নিহিত ছিল তৎকালীন বাংলার বহুমাত্রিক সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ঢেউয়ে। এই সময়কালটি ছিল বাংলা সমাজের আত্মজাগরণ, নবচেতনা এবং গভীর আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের যুগ।

উনিশ শতকের বাংলা একদিকে ছিল হিন্দু নবজাগরণের সূতিকাগার; রাজা রামমোহন রায় ও ব্রাহ্ম সমাজের মাধ্যমে হিন্দুধর্মে সংস্কারের প্রচেষ্টা চলছিল জোরকদমে, অপরদিকে মুসলিম সমাজেও চলছিল গভীর অস্থিরতা ও নবচেতনার সূচনা। হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন, সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীরের সংগ্রাম এবং উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের নেতৃত্বে আধুনিকতাবাদী চিন্তার উন্মেষ মুসলিম জনমানসে নতুন ভাবনার দ্বার উন্মোচন করছিল। মুসলিম সমাজের চিন্তাশীল অংশ ক্রমাগত প্রশ্ন করছিল—কীভাবে তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যকে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয় ঘটানো যায়?

কীভাবে ইসলামের মৌলিক বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই পৌঁছানো সম্ভব?

এই পরিবর্তনকামী সমাজে বাংলা ভাষাও রূপান্তরকালে প্রবেশ করেছিল। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (প্রতিষ্ঠিত ১৮০০) এবং শ্রীরামপুর মিশনের খ্রিস্টান মিশনারিদের (বিশেষত উইলিয়াম কেরি) ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্য সাহিত্যের আধুনিক রূপ, কাঠামো ও শৈলিক পরিচয় গঠিত হচ্ছিল। সংবাদপত্র ও সাময়িকীর আবির্ভাব—যেমন সমাচার দর্পণ, সম্বাদ কৌমুদী—জনমত গঠনের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা ও মতবিনিময়ের এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিল।

এদিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলার মুসলমানরা, বিশেষত অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণী, তুলনামূলকভাবে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় পশ্চাৎপদ থেকে যাচ্ছিল। মাদ্রাসাভিত্তিক আরবি-ফারসি শিক্ষাচর্চা ছিল মূলত সীমাবদ্ধ ও কেতাবি। অথচ বাংলাভাষী সাধারণ মুসলমানদের দৈনন্দিন ভাষা ছিল বাংলা; কিন্তু পবিত্র কুরআনের উপলব্ধি ও অধ্যয়নে তারা নির্ভর করত মূলত আলেমদের মৌখিক ব্যাখ্যা ও ওয়াজ-নসিহতের উপর। ফলে তারা কুরআনের মূল বার্তা ও আধ্যাত্মিক নির্দেশনা থেকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন রয়ে যাচ্ছিল। এই বিচ্ছিন্নতা তাদের ধর্মীয় চেতনা ও সামাজিক জীবনে এক গভীর শূন্যতা তৈরি করছিল।[14]

এই প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ছিল সময়ের দাবি ও এক গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াহিক প্রয়াস। বিশেষত খ্রিস্টান মিশনারিরা যখন বাংলা ভাষায়

---

[14] Abbas, Zaheer. *Construction of Bengali Muslim Identity in Colonial Bengal, c. 1870–1920*. Master's thesis, University of North Carolina at Chapel Hill, Department of History, 2010.

De, Amalendu. "The Social Thoughts and Consciousness of the Bengali Muslims in the Colonial Period." *Social Scientist* 23, no. 4/6 (1995): 16–37.

বাইবেলের অনুবাদ ও তার বহুল প্রচারের মাধ্যমে ধর্মপ্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছিল, তখন মুসলিম আলেম ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নিজস্ব ধর্মগ্রন্থের বাংলা অনুবাদের তীব্র প্রয়োজনবোধ সৃষ্টি হয়। এই অনুবাদ কেবল ধর্মীয় দায়িত্ববোধের ফল ছিল না, বরং এটি ছিল আত্মপরিচয়ের পুনরুদ্ধার, ভাষাগত অন্তরায় ভেঙে দেওয়ার এবং এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কুরআনিক শিক্ষার সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের একটি ঐতিহাসিক প্রয়াস।

বিশ শতকে এসে এই অনুবাদচর্চা আরও বেগবান ও বিস্তৃত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে অনুবাদগুলো সাধু ভাষায় রচিত হলেও ধীরে ধীরে চলিত ভাষার দিকে ঝোঁক বাড়ে, যা সাধারণ পাঠকের জন্য অধিক গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। একইসাথে শুধুমাত্র আক্ষরিক অনুবাদ নয়, বরং তাফসির বা ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়—যা কুরআনের গভীরতর ভাবার্থ ও প্রেক্ষাপট অনুধাবনে সহায়ক হয়। ফলে বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদ এক নতুন ধারায় প্রবেশ করে, যা কেবল ভাষান্তর নয়, বরং এক দাওয়াহিক ও জ্ঞানচর্চার আন্দোলনে পরিণত হয়।

বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদের পথিকৃৎ

বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদের দীর্ঘ পথচলায় বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান অবদান রেখেছেন। নিচে কালানুক্রমিকভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের প্রচেষ্টা ও তাদের কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

- ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দ, শাহ মুহম্মদ সগীর: বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক কবি শাহ মুহম্মদ সগীর বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের সূরা অনুবাদ করেন। তিনি যুগপৎ বাংলা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে কোরআন অনুবাদ করেছেন। পবিত্র কোরআন আরবিতে ছন্দোবদ্ধ হলেও, উনিশ শতকে যখন পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ শুরু হয়, তখন গদ্যরীতির পাশাপাশি কাব্যিক অনুবাদও জনপ্রিয় ছিল। সগীরের কাজটি এই ধারার

প্রাচীনতম নিদর্শন হতে পারে।

- ১৬২০, আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০): মধ্যযুগের এই বরেণ্য ও ভাষাপ্রেমী বাঙালি কবি সরাসরি কুরআন অনুবাদ না করলেও, তাঁর বিখ্যাত ‘নূরনামা’ কাব্যে বাংলা ভাষায় কোরআন অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন, যা পরবর্তীকালের অনুবাদকদের অনুপ্রাণিত করে থাকতে পারে।

- ১৮০৮, আমির উদ্দিন বসুনিয়া: রংপুর জেলার এই ব্যক্তি বাংলা গদ্যভাষায় প্রথম কোরআন অনুবাদ করেন বলে মুহম্মদ মুজিবুর রহমান তার 'বাংলা ভাষায় কোরআন চর্চা' (ঢাকা, ১৯৮৬) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদের মতে, বসুনিয়ার ‘অনুবাদটি ছিল বাংলা পুঁথি সাহিত্যের ভাষায় আমপারার কাব্যানুবাদ’ (বাংলা ভাষায় কোরআন চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ২০০৯, পৃষ্ঠা ৯৫)। অর্থাৎ, তার অনুবাদটি ছিল খণ্ডিত (৩০তম পারা) এবং পয়ার ছন্দে রচিত। পূর্ণাঙ্গ বা গদ্য অনুবাদ নয়।

- ১৮৬৮, আকবর আলী: কলকাতায় জন্মগ্রহণকারী আকবর আলী ‘তরজমা আমছেপারা’ নামে পবিত্র কোরআনের আমপারার অনুবাদ করেন এবং ১৮৬৮ সালে কলকাতা থেকে তা প্রকাশ করেন। গবেষক মোফাখখার হুসেইন খান তাকেই বাংলা ভাষায় প্রথম কোরআন অনুবাদক হিসেবে সাব্যস্ত করার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যদিও তা ছিল খণ্ডিত অনুবাদ।

- ১৮৭৩, পাদ্রি তারাচরণ মিত্র: হিন্দু ধর্ম থেকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত তারাচরণ মিত্র পবিত্র কোরআনের প্রথম ১২ পারা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৭৩ সাল থেকে কলকাতার 'বঙ্গমিহির' নামক পত্রিকায় তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে এবং পরে ১৮৮২ সালে পুস্তিকা আকারেও প্রকাশ পায়। তার উদ্দেশ্য ধর্মীয় বিতর্কের উপাদান সংগ্রহ ছিল

বলে মনে করা হয়।

- ১৮৮১, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০): নরসিংদী জেলায় জন্মগ্রহণকারী গিরিশচন্দ্র সেন প্রথমে হিন্দু ও পরে ব্রাহ্মধর্মের অনুসারী হন। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় পবিত্র কোরআনের পূর্ণাঙ্গ গদ্য অনুবাদ করতে সমর্থ হন। ১৮৮১ সালে তার অনূদিত প্রথম খণ্ড এবং ১৮৮৫ সালের মধ্যে সব খণ্ড প্রকাশিত হয়। তার অনুবাদে পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠা থাকলেও সংস্কৃতজাত বাংলা শব্দের প্রাবল্যের কারণে তৎকালীন মুসলিমসমাজে তা শুরুতে ততটা জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। তবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম এবং তিনি মুসলিম সমাজ কর্তৃক 'ভাই' উপাধিতে ভূষিত হন।

- ১৮৮৭, মাওলানা নঈম উদ্দিন (রহ.) (১৮৩২-১৯০৯): টাঙ্গাইলের করটিয়ার এই আলেম গিরিশচন্দ্র সেনের অনুবাদের পর মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি ১৮৭৩ সাল থেকে 'আখবারে এসলামিয়া' পত্রিকায় অনুবাদ প্রকাশ শুরু করেন এবং ১৮৮৭ সালের দিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন (যদিও সম্পূর্ণ করতে পারেননি)। তার অনুবাদ ছিল সাধু ভাষায় এবং আরবি-ফারসি শব্দবহুল। তিনি প্রায় দশ পারা অনুবাদ সম্পন্ন করেছিলেন।[15]

- ১৮৮৯, আকবর উদ্দিন: উত্তর বাংলার দিনাজপুর থেকে ১৮৮৯ সালে 'কোরআন' নামে পবিত্র কোরআনের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। অনুবাদ গ্রন্থটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য হলেও 'বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জি'-তে (মো. আবদুর রাজ্জাক, রাজশাহী : ১৯৮৮ প্রণীত) এই অনুবাদের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

- ১৮৯১, ফিলিপ বিশ্বাস: একজন বাঙালি (দেশীয়) খ্রিস্টান হিসেবে তিনি

---

[15] রহমান, ড. মুহাম্মদ মুজীবুর। *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চার পটভূমি*।

প্রথম পবিত্র কোরআন অনুবাদ করেন। কলকাতা থেকে ১৮৯১ সালে প্রকাশিত এই অনুবাদের উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্মকে হেয় করা ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এ জন্য এটি বিনামূল্যে বিতরণ করা হতো। পরে মুসলিমদের তীব্র আপত্তির মুখে ব্রিটিশ সরকার অনুবাদটি বাজেয়াপ্ত করে।

- ১৯০৫, মাওলানা আব্বাছ আলী (১৮৫৯-১৯৩২): পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাটের এই আলেমকে অনেক গবেষক বাংলা ভাষায় কোরআনের প্রথম *পূর্ণাঙ্গ মুসলমান অনুবাদক* হিসেবে গণ্য করেন। তার অনুবাদ ১৯০৮ বা ১৯০৯ সালের দিকে প্রকাশিত হয়। তিনি গদ্য ও পদ্য উভয় রীতিতেই অনুবাদ করেছেন।

- ১৯০৫, মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) ও মাওলানা আব্বাছ আলীর যৌথ উদ্যোগ: মওলানা আকরম খাঁ প্রথমদিকে গিরিশচন্দ্র সেনের অনুবাদকে অভিনন্দিত করলেও পরে অনুবাদের কাজে নিজেই যুক্ত হন। তিনি মাওলানা আব্বাছ আলীর সঙ্গে যৌথভাবে ১৯০৫ সালে একটি ত্রিভাষিক (আরবি, বাংলা ও উর্দু) কোরআন অনুবাদ প্রকাশে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি এককভাবে পূর্ণাঙ্গ তাফসিরসহ অনুবাদ সম্পন্ন করেন যা অত্যন্ত প্রভাবশালী।

- ১৯০৮, রেভারেন্ড উইলিয়াম গোল্ডস্যাক (১৮৬১-১৯৫০): সাউথ অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপ্টিস্ট মিশনের পক্ষ থেকে রেভারেন্ড গোল্ডস্যাক ইসলাম সম্পর্কে অপপ্রচারের উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআন অনুবাদ করে ফরিদপুর থেকে প্রকাশ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ১৯০৮ থেকে শুরু করে মোট ১২ খণ্ডে তিনি পুরো কোরআন অনুবাদ করে প্রকাশ করেন, যাতে তার ১২ বছর সময় লেগেছিল।

- শ্রী কিরণ গোপাল সিংহ (১৮৮৫-১৯৪২): হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র সেনের পর কিরণ গোপাল সিংহ ইসলাম ধর্মের প্রতি ব্যক্তিগত অনুরাগ থেকে পবিত্র কোরআন বাংলা ভাষায় অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন

বলে জানা যায়।

- ১৯১১, মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সানী (১৮৫৬-১৯১৮): সিরাজগঞ্জের এই সমাজকর্মী ও সাহিত্যিক 'বাংলা কোরআন শরিফ' নামে কোরআন বাংলায় অনুবাদ করেন। তবে 'বাংলা কোরআন' নামটি নিয়ে তৎকালীন আলেম সমাজ আপত্তি তুলেছিল, কারণ কোরআন আরবিতেই নাজিল হয়েছে; এর অনুবাদকে 'বাংলা কোরআন' বলা অনুচিত মনে করা হয়েছিল।

- ১৯১৩, আলাউদ্দীন আহমদ (১৮৫১-১৯১৫) ও হাফেজ মাহমুদ শাহ: সিরাজগঞ্জের সুসাহিত্যিক আলাউদ্দীন আহমদ হাফেজ মাহমুদ শাহর সাহায্যে যুগ্ম নামে 'তাফসির রুহুল বয়ান' অবলম্বনে সূরা আল কদরের বঙ্গানুবাদ ১৯১৩ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন।

- ১৯১৪, মাওলানা খোন্দকার আবুল ফজল আবদুল করিম (১৮৭৬-১৯৪৭): টাঙ্গাইলের এই আলেম ১৯১৪ সালে ‘কোরআন’ নামে বাংলা ভাষায় পবিত্র কোরআন অনুবাদ করেন এবং টাঙ্গাইল থেকে মুদ্রণ করে প্রকাশ করেন। তিনি আমপারার কাব্যানুবাদও করেছিলেন। পরে তার অনুবাদের অন্যান্য খণ্ড কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

- ১৯১৬, মুন্সী করিম বখশ: কলকাতার অধিবাসী মুন্সী করিম বখশ ১৯১৬ সালে পবিত্র কোরআনের প্রথম ও শেষ পারার বাংলা অনুবাদ কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। তিনিই প্রথম তার অনুবাদে মূল আরবির বাংলা উচ্চারণ (প্রতিবর্ণায়ন) যুক্ত করার প্রথা চালু করেন, যা আরবিতে অনভিজ্ঞদের জন্য সহায়ক হলেও আলেমদের একাংশ একে সমর্থন করেননি। তবে এই ধারাটি অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।

- ১৯১৭, আবদুল ছাত্তার সুফী: কলকাতা থেকে ১৯১৭ সালে পবিত্র কোরআনের আয়াত বাংলা কবিতার ত্রিপদী ছন্দে কাব্য আকারে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন তিনি। ত্রিপদী ছন্দে কোরআন অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রথম।

- ১৯১৭, মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমিন (১৮৭৫-১৯৪৫): পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগনার এই আলেম কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে সনদপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি ১৯১৭ সালে পবিত্র কোরআন অনুবাদ করেন, যা তৎকালীন মুসলিমসমাজে আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল।
- ১৯২০, মাওলানা এয়ার আহমদ এলটি (-১৯৪৪): ফেনী জেলার এই আলেম 'আমপারা বাঙ্গালা তফছির' নামে কোরআন অনুবাদ করে ১৯২০ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশ করেন।
- ১৯২২, মোহাম্মদ আবদুল হাকিম (১৮৮৭-১৯৫৭) ও মোহাম্মদ আলী হাসান: গোপালগঞ্জের মোহাম্মদ আবদুল হাকিম এবং মানিকগঞ্জের মোহাম্মদ আলী হাসান যৌথভাবে 'কোরআন শরিফ' নামে তাফসিরসহ পবিত্র কোরআনের অনুবাদ সম্পাদন করেন এবং কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকসহ অনেক মুসলিম নেতা তাদের অনুবাদের প্রশংসা করেছিলেন।
- ১৯২৩, মাওলানা শেখ ইদ্রিস আহমদ (১৮৯২-?): চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার এই আলেম 'কোরআনের মহাশিক্ষা' নামে কোরআন অনুবাদ করেন, যা ১৯২৩, ১৯২৭ ও ১৯৩৪ সালে মোট তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়।
- ১৯২৪, মাওলানা ফাজেল মকিমী: কলকাতার অধিবাসী এই আলেম ১৯২৪ সালে পবিত্র কোরআনের দু-তিন পারা অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায়, কিন্তু তার অনুবাদের কোনো কপি পাওয়া যায়নি। (সূত্র: ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৭৪)
- ১৯২৫, ফয়জুদ্দীন আহমেদ (১৮৯৯-১৯৩৫): বরিশালের ফয়জুদ্দীন আহমেদ সূরা ফাতিহা ও এর তাফসির অনুবাদ করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভূমিকাসহ এটি ঢাকা থেকে ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়।

- ১৯২৬, ফজলুর রহীম চৌধুরী (১৮৯৬-১৯২৯): বরিশালের এই লেখক (শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের জামাতা) প্রথমে ‘কোরআনের সুবর্ণ পঞ্জিকা’ নামে বিশেষ সূরা ও আয়াতের অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরে পূর্ণাঙ্গ ‘কোরআন শরিফ’ অনুবাদ করেন, যা তার মৃত্যুর পর ১৯৩০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

- ১৯২৬, মাওলানা খন্দকার গোলাম রসুল: ঝিনাইদহের এই আলেম ‘বাঙ্গালা পাঞ্জ সুরাহ’ নামে কোরআনের নির্বাচিত সূরা অনুবাদ করেন, যা ১৯২৬ সালে নদিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

- ১৯২৭, মোহাম্মদ আবদুর রশিদ ছিদ্দিকী: কক্সবাজারের এই লেখক ‘মহা কোরআন কাব্য’ নামে গদ্য ও পদ্য রীতিতে কোরআন অনুবাদ করে ১৯২৭ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন।

- ১৯২৮, মাওলানা ওসমান গনি: পশ্চিম বাংলার বর্ধমানের এই আলেম ১৯১৪ সালে পাঞ্জ সূরা অনুবাদ করেন ('পঞ্চমণি' নামে), যা ১৯২৮ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। পরে ‘পবিত্র কোরআন’ শিরোনামে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন যা ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। তিনিও তার অনুবাদে আরবির বাংলা উচ্চারণ সংযোজন করেন।

- ১৯২৮, মাওলানা আহমদ আলী (১৮৯৮-১৯৫৯): যশোরের এই আলেম ১৯২৮ সালে সূরা ইয়াসিনের অনুবাদ প্রকাশ করেন।

- ১৯২৯, মাওলানা কফিলউদ্দিন আস সিদ্দিকী: টাঙ্গাইলের এই আলেম ১৯২৯ সালে ‘তরজমা পাঞ্জে সুরা’ নামে কোরআনের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি সূরা অনুবাদ করেন, যা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তবে এর কপি দুষ্প্রাপ্য।

- ১৯৩০, মোরশেদ আলী: ‘কোরআন দর্পণ’ নামে পবিত্র কোরআনের বাংলা অনুবাদ (প্রথম খণ্ডে ১৭টি সূরা) ১৯৩০ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশ

করেন।

- ১৯৩০, মীর ফজলে আলী (১৮৯৮-১৯৩৯): বরগুনার মীর ফজলে আলী 'কোরআন কণিকা' শিরোনামে কোরআনের অংশবিশেষ অনুবাদ করে ১৯৩০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর ভূমিকা লিখেছিলেন।
- ১৯৩১, মুহাম্মদ আজহার উদ্দীন: রাজবাড়ীর মুহাম্মদ আজহার উদ্দীন 'কোরআনের আলো' শিরোনামে কোরআনের দীর্ঘ সূরাগুলো অনুবাদ করে ১৯৩১ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন।
- ১৯৩২, আবদুল আযীয হিন্দি (১৮৬৭-১৯২৬): কুমিল্লার আবদুল আযীয হিন্দির 'কোরআন শরিফ' শিরোনামে অনূদিত কোরআন তার মৃত্যুর পর নোয়াখালী থেকে ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়।
- ১৯৩৩, কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬): বাংলা সাহিত্যের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম পবিত্র কোরআনের আমপারা অংশ কাব্যাকারে অনুবাদ করেন। এটি 'কাব্য আমপারা' নামে কলকাতা থেকে ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি কাব্যানুবাদের পাশাপাশি মার্জিনে গদ্যে অর্থও দিয়েছেন। এর আগেও তিনি বিচ্ছিন্নভাবে কিছু অনুবাদ করেছিলেন।
- ১৯৩৪, সৈয়দ আবুল খায়ের তাজুল আউলিয়া জাহাঙ্গীর: টাঙ্গাইল থেকে ১৯৩৪ সালে 'বাংলা কোরআন শরিফ' নামে পবিত্র কোরআনের প্রথম পারার অনুবাদ প্রকাশ করেন।
- ১৯৩৫, সৈয়দ আবুল মনসুর: সিলেটের সৈয়দ আবুল মনসুর কলকাতা থেকে ১৯৩৫ সালে 'কোরআন কুসুমাঞ্জলি' নামে অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরে 'কোরআন মঞ্জরি', 'কোরআন মঙ্গল' ইত্যাদি নামে আরও কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুসরণে কোরআনের কাব্যানুবাদ করেন।

- ১৯৩৬, আইয়ুব আলী চৌধুরী (১৮৭৭-১৯৩৬): বাংলা পয়ার ছন্দে সূরা ফাতিহার কাব্যানুবাদ করে ‘স্বর্গীয় কানন’ নামে ১৯৩৬ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন।
- ১৯৩৬, মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম আকবর (১৮৯২-১৯৫৬): যশোর থেকে ১৯৩৬ সালে ‘আমপারার তফসির’ নামে কোরআন অনুবাদের খণ্ড প্রকাশ করেন।
- ১৯৩৭, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়: হিন্দু ব্রাহ্মণদের মধ্যে বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় প্রথম কোরআন অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। ‘পবিত্র কোরআন প্রবেশ’ নামে তার অনুবাদ ১৯৩৭ সালে নারায়ণগঞ্জ থেকে মুদ্রিত হয়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।
- ১৯৩৯, মুহাম্মদ ইসমাইল: চাঁদপুরের মুহাম্মদ ইসমাইল কোরআনের ৩০তম পারা অনুবাদ করে ‘আমপারার তরজমা’ নামে ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরা থেকে প্রকাশ করেন।
- ১৯৪০, মুহাম্মদ শামসুল হুদা: নরসিংদীর মুহাম্মদ শামসুল হুদা ‘নেয়ামুল কোরআন’ নামে কোরআনের বিভিন্ন সূরার অনুবাদ ও ফজিলতসহ ১৯৪০ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশ করেন।
- ১৯৪১, খানবাহাদুর আহসানউল্লা (১৮৭৩-১৯৬৫): সাতক্ষীরার খানবাহাদুর আহসানউল্লা কোরআনের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি সূরা অনুবাদ করে ‘পাঁচ ছুরা’ নামে ১৯৪০-৪৭ এর মধ্যে কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন।
- ১৯৪৪, মীজানুর রহমান: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মীজানুর রহমান মায়ের নির্দেশে কোরআন অনুবাদ করে ‘নূরের ঝলক’ বা ‘কোরআনের আলো’ নামে ১৯৪৪ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন।
- ১৯৪৫, মাওলানা যুলফিকার আলী: ফেনীর এই আলেম কোরআনের আমপারার অংশ অনুবাদ করে ১৯৪৫ সালে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশ করেন।

তার বিশেষত্ব ছিল, তিনি আরবি অক্ষরে বাংলা অনুবাদ করেন, যা এই রীতিতে প্রথম।

- ১৯৪৬, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯): বহুভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'মহাবাণী' শিরোনামে কোরআনের অনুবাদ (সূরা ফাতিহা থেকে সূরা ফিল পর্যন্ত) ১৯৪৬ সালে বগুড়া থেকে প্রকাশ করেন। তিনি সূরা বাকারাও অনুবাদ করেছিলেন। তার অনুবাদে সংস্কৃতজাত শব্দের ব্যবহার ছিল বেশি (যেমন: ইমাম>আচার্য, নবী>সংবাদবাহক)।

- ১৯৪৭, মাওলানা মুনীর উদ্দীন আহমদ: রংপুরের এই আলেম 'হাফিজিল কাদেরী' নামে তাফসিরসহ কোরআনের অনুবাদ ১৯৪৭ সালে রংপুর থেকে প্রকাশ করেন।

- ১৯৬২, 'তাফসিরে আশরাফী' (অনুবাদ): মূল: আল্লামা আশরাফ আলী থানভি (রহ.)। প্রকাশক: এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা। এটি মূলত থানভীর 'বয়ানুল কুরআন'-এর অনুবাদ।

- ১৯৬৩, 'সহজ পাক তফসির': খন্দকার মোহাম্মদ হুছাইন। পাকুল্লা, টাঙ্গাইল।

- ১৯৬৬-৬৭, 'পবিত্র কোরান': কাজী আব্দুল ওদুদ। ফরিদপুর, পরে কলকাতা।

- ১৯৬৭, 'কোরআন শরিফ': অনুবাদক: আলী হায়দার চৌধুরী। প্রকাশক: ঝিনুক প্রকাশনী।

- ১৯৬৭, 'কোরআনুল করিম': অনুবাদক: শামসুল ওলামা বেলায়েত হোসেন ও অন্যান্য। প্রকাশক: ইসলামিক একাডেমি, ঢাকা (বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)। এটি ফাউন্ডেশনের প্রাতিষ্ঠানিক অনুবাদের প্রাথমিক রূপ।

- ১৯৬৮, 'কোরআনের মুক্তাহার': মাওলানা মোহাম্মদ ছায়ীদ ইব্রাহিমপুরী।

ইব্রাহিমপুর, চাঁদপুর।

- ১৯৬৯, 'কোরআন শরিফ': অনুবাদক: হাকিম আব্দুল মান্নান। সহজ-সরল ভাষায় মূলানুগ অনুবাদ। প্রকাশক: তাজ কম্পানি, ঢাকা।
- ১৯৭০, 'তাফাসরুল কোরআন': শব্দার্থসহ তাফসির। মুহা. নূরুল ইসলাম, বগুড়া।
- ১৯৭০-৭২, 'আল-কোরআন : তরজমা ও তাফসির': পাঁচ খণ্ড। অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের, কলকাতা আলিয়া মাদরাসা।
- ১৯৭৪, 'তাফসিরে বয়ানুল কোরান'-এর বঙ্গানুবাদ: মাওলানা নূরুর রহমান। প্রকাশক: এমদাদিয়া লাইব্রেরি। মূল : আল্লামা আশরাফ আলী থানভি (রহ.)। (এটি ১৯৬২ সালের অনুবাদের ভিন্ন সংস্করণ বা পুনর্মুদ্রণ হতে পারে)।
- ১৯৭৪, 'কোরআন শরিফ': টীকাসহ অনুবাদ। মোবারক করিম জওহর। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী।
- ১৯৭৫, 'তাফহিমুল কোরআন' (অনুবাদ): মূল: মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদী (রহ.)। অনুবাদক: অধ্যাপক গোলাম আযম। প্রকাশক: মাহবুব প্রকাশনী। (পরবর্তীতে আধুনিক প্রকাশনী ও ইসলামিক পাবলিকেশন্স থেকেও প্রকাশিত)।
- ১৯৭৭, 'পবিত্র কোরআন শরিফ': মূল আরবিসহ বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও ব্যাখ্যা। এ কে এম ফজলুর রহমান মুন্সী, রাজামেহার, কুমিল্লা।
- ১৯৮০, 'তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন' (অনুবাদ): অনুবাদক: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। মূল: মুফতি মুহম্মদ শফী উসমানী (রহ.)। এটি বাংলা ভাষায় সর্বাধিক জনপ্রিয় ও নির্ভরযোগ্য তাফসিরগুলোর অন্যতম।

- ১৯৮২, ‘তাফসিরে জালালাইন’ (অনুবাদ): অনুবাদক: মুহম্মদ খুরশীদ উদ্দীন।
- ১৯৮৭, ‘বাংলা কোরান শরিফ’: আব্দুদ দাইয়্যান চিশতী (মাওলানা শাহ সুফী)। ছারছীনা, বরিশাল। প্রকাশক: কথাকলি।
- ১৯৮৮, ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান: অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ও তাফসির (তাফসীরে মুজিবুর রহমান)।
- ১৯৮৮, ‘তাফসিরে ইবনে কাছির’ (অনুবাদ): অনুবাদক: অধ্যাপক আখতার ফারুক। প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
- ১৯৯২, ‘কোরআন শরিফ’: ড. ওসমান গনি। কলকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স। (সম্ভবত ১৯২৮ সালের মাওলানা ওসমান গনির কাজের পুনর্মুদ্রণ বা ভিন্ন সংস্করণ)।
- ১৯৯৩, ‘তাফসির-ই জালালাইন’ (অনুবাদ): অনুবাদক: মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ। মূল: জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহ.)। প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
- ১৯৯৪, ‘তাফসিরে নূরুল কোরআন’: মাওলানা মো. আমিনুল ইসলাম। প্রকাশক: আলবালাগ পাবলিকেশন্স।
- ১৯৯৪, ‘তাফসিরে মাজেদি শরিফ’ (অনুবাদ): অনুবাদক: মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান মল্লিক। মূল: মাওলানা আব্দুল মজিদ দরিয়াবাদি। প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
- ১৯৯৪, ‘পবিত্র কোরআনুল করিম : বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির’: (মা‘আরেফুল কোরআনের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)। প্রকাশক: সৌদি দূতাবাস, ঢাকা।
- ১৯৯১-৯৫, ‘তাফসিরে তাবারি শরিফ’ (অনুবাদ): অনুবাদক: মাওলানা

মুহাম্মদ সাখাওয়াত উল্লাহ। মূল: আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির তাবারি (রহ.)। প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

- ১৯৯৫, 'তাফসির ফি যিলালিল কোরআন' (অনুবাদ): অনুবাদক: হাফিজ মুনির উদ্দীন আহমদ। মূল: সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহ.)। প্রকাশক: আল কোরআন একাডেমি, লন্ডন।
- ১৯৯৬, 'ছহীহ বঙ্গানুবাদ কোরআন শরিফ': মাওলানা এম এ বশির উদ্দিন।
- ১৯৯৬-৯৭, 'তাফসিরে উসমানী' (অনূদিত): প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন। মূল: মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী ও মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী।
- ১৯৯৭, 'কোরান শরিফ': ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান। প্রকাশক: খোশরোজ কিতাব মহল।
- ১৯৯৮, 'শাহনূর কোরআন শরিফ': মাওলানা মাজহার উদ্দীন আহমদ, ছারছীনা।
- ১৯৯৮, মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম: (পরবর্তীতে তাকী উসমানীর তাফসির অনুবাদ করেন)।
- ১৯৯৯, 'তাফসিরে কোরআন': সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী।
- ২০০০, 'কোরআন শরিফ : সরল বঙ্গানুবাদ': বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।
- ২০০২, 'কোরআন শরিফ : সহজ সরল বাংলা অনুবাদ': হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ। প্রকাশক: আল কোরআন একাডেমি, লন্ডন।
- ২০০৬, 'পবিত্র আল কোরআনের পুঁথি অনুবাদ': মাওলানা আব্দুল হামিদ কাসেমী। প্রকাশক: নিউ হামিদিয়া প্রকাশনী।

- ২০১০, ‘কোরআন শরিফ’ (আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর ইংরেজি অনুবাদের বাংলা): অনুবাদক: মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ যাকারিয়া। প্রকাশক: মীনা বুক হাউস।
- ২০১১, ‘নূর নূরানি বাংলা উচ্চারণ, বঙ্গানুবাদ ও শানে নজুলসহ কোরআন শরিফ’: মাওলানা মোহাম্মদ ওসমান গনি। প্রকাশক: সোলাইমানি বুক হাউজ।
- ২০১২, ‘বঙ্গানুবাদ কোরআন শরিফ’: মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহিম (রহ.)। প্রকাশক: খায়রুন প্রকাশনী।
- ২০১৭, ‘তাফসিরে তাওযিহুল কোরআন’ (অনুবাদ): মূল: শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী। অনুবাদ: মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম। প্রকাশক: মাকতাবাতুল আশরাফ।
- ২০১৮, ‘সহজ কোরআন’: আসিফ সিবগাত ভূঞা। প্রকাশক: আদর্শ।[16]
- ২০২১, মহিমান্বিত কুরআন: সিয়ান পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত এই অনুবাদ গ্রন্থটি মূলত দুই ভাগে বিভক্ত। সাবলীল অনুবাদ ও শব্দে-শব্দে অনুবাদ। সাবলীল অনুবাদ করেছেন মুফতি আবু উমামা কুতুবুদ্দীন মাহমূদ ও মুফতি আব্দুল্লাহ শিহাব। আর শব্দানুবাদ বিন্যাস করেছেন ওমর আলী আশরাফ, নূর মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ, আহমদ ইমতিয়াজ আল-আরাব ও যায়েদ মুহাম্মদ। নিরীক্ষণ করেছেন বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের সহকারী মহাপরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের এবং জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগের সিনিয়র মুহাদ্দিস মাওলানা আহমদ মায়মুন।

---

[16] হাননান, ড. মোহাম্মদ, *পবিত্র কোরআন বাংলা অনুবাদের ইতিহাস ও তুলনামূলক আলোচনা*, আগামী প্রকাশনী

সমকালীন প্রেক্ষাপট

একবিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদের ধারা কেবল অব্যাহতই থাকেনি, বরং তা নতুন মাত্রা, গভীরতা ও বহুমাত্রিক বৈচিত্র্য লাভ করেছে। এই সময়ের অনুবাদসমূহ শুধু সংখ্যায়ই বৃদ্ধি পায়নি, বরং গুণগত উৎকর্ষ, ভাষার নান্দনিকতা, শৈলী ও ব্যাখ্যার পদ্ধতিতেও বৈচিত্র্য এসেছে।

বর্তমানে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন মান, আঙ্গিক ও দৃষ্টিভঙ্গির অসংখ্য কুরআন অনুবাদ ও তাফসির সহজলভ্য। সরকারি উদ্যোগ, স্বনামধন্য বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থা এবং ব্যক্তি উদ্যোগে বিভিন্ন অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, যা বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সামনে কুরআনের বার্তা আরও সুলভ, সহজবোধ্য ও ভাবগভীর করে তুলেছে।

বিশেষত তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব ও ডিজিটাল মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞানচর্চার প্রসারের ফলে, পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদ এখন এক ক্লিকের দূরত্বে। ইন্টারনেট, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ব্লগের কল্যাণে বাংলা ভাষায় কুরআন পাঠ, শ্রবণ, গবেষণা এবং পরস্পরের অনুবাদসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি সহজ, গতিশীল ও সমৃদ্ধ হয়েছে।

অনলাইনভিত্তিক বহু প্ল্যাটফর্ম—যেমন: quran.com, quraneralo.com, quranmazid.com, al-quran.info ইত্যাদি—পাঠকদের জন্য বহুভাষিক ও বহুমাত্রিক উপস্থাপন প্রণালি গ্রহণ করেছে। সেখানে আয়াতভিত্তিক অনুবাদ, শব্দভিত্তিক বিশ্লেষণ, বিভিন্ন তাফসির ও ভাষ্যপাঠ, এবং নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনা একত্রে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা পাঠককে কুরআনের অর্থ ও প্রেক্ষাপট গভীরভাবে অনুধাবনের সুযোগ করে দিচ্ছে।

একইসাথে, বাংলা অনুবাদ নিয়ে একাডেমিক পরিমণ্ডলে গবেষণা, পিএইচডি থিসিস, প্রবন্ধ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনামূলক আলোচনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনুবাদের ভাষা, শব্দচয়ন, শৈলী, ভাবসম্প্রসারণ, আরবি মূল পাঠের বিশ্বস্ততা এবং লক্ষ্যভাষার প্রাঞ্জলতা—এই সবগুলো বিষয়ে এখন আরও বেশি সচেতনতা ও বিচারবোধ লক্ষ করা যাচ্ছে।

বিশেষ করে কিছু স্পর্শকাতর, বহু অর্থবোধক বা শাস্ত্রীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ শব্দের অনুবাদ, নারী সংক্রান্ত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা, মাযহাবভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিদগ্ধ আলেম, গবেষক ও সচেতন পাঠকদের মধ্যে চিন্তাশীল পর্যালোচনা ও গঠনমূলক বিতর্ক চলছে।

এই সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে অনুবাদকদের সামনে রয়েছে একটি দোদুল্যমান চ্যালেঞ্জ—মূল আরবি পাঠের যথাসম্ভব বিশ্বস্ততা রক্ষা করা, আবার একইসাথে বাংলা ভাষার সৌন্দর্য, স্বাভাবিকতা ও মর্মবোধ অক্ষুণ্ণ রাখা। একদিকে শাব্দিক অনুবাদে নির্ভুলতা; অন্যদিকে ভাবার্থের গভীরতা ও ভাষার প্রাণবন্ততা—এই ভারসাম্য রক্ষা করাই আজকের বাংলা কুরআন অনুবাদের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সাধনা।

পবিত্র কুরআন অনুবাদের চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবতা

পবিত্র কুরআনের অনুবাদ নিঃসন্দেহে এক মহিমান্বিত ও পরম পুণ্যময় কর্ম। এটি যেমন ইসলামের শাশ্বত মর্মবাণীকে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক অপরিহার্য সেতুবন্ধন, তেমনি এর যথাযথ সম্পাদনে প্রয়োজন হয় বহুস্তর বিশ্লেষণ, প্রজ্ঞা এবং নিখুঁত ভারসাম্যের এক নিরন্তর প্রচেষ্টা। কুরআনের অনুবাদকে তাই কেবল নিছক ভাষান্তর হিসেবে দেখলে ভুল হবে; এটি জ্ঞানের গভীর সমুদ্রে নাবিকত্ব, ঈমানদীপ্ত দায়িত্ববোধ এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির এক সম্মিলিত সংগ্রাম।

১. কুরআনের ই‘জায ও অনুবাদের সীমাবদ্ধতা

মুসলিম উম্মাহর গভীর বিশ্বাস অনুযায়ী, পবিত্র কুরআন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এক অলৌকিক গ্রন্থ। এর ভাষার উৎকর্ষ (ফাসাহা), গঠনশৈলীর

সৌন্দর্য (বালাগাহ), অনুপম ছন্দ ও বিন্যাস (নাযম) এবং অর্থের গভীরতা এতটাই অতুলনীয় যে, মানবসৃষ্ট কোনো রচনা এর সমকক্ষ হতে পারে না বা এর ভাব ও রুহানিয়াতকে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করতে পারে না। কুরআনের এই অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্যই 'ই'জাযুল কুরআন' নামে পরিচিত।

এই প্রেক্ষাপটে, কুরআনের কোনো অনুবাদই মূল গ্রন্থের ভাষা, সৌন্দর্য, অলৌকিক বৈশিষ্ট্য বা আধ্যাত্মিকতার সমকক্ষ হতে পারে না। অনুবাদকে বরং মূল অর্থের একটি ব্যাখ্যামূলক উপস্থাপনা বা 'তাফসিরের একটি রূপ' হিসেবেই গণ্য করা উচিত। সুতরাং, অনুবাদকে কুরআনের বিকল্প নয়, বরং এর মর্মার্থ অনুধাবনের একটি সহায়ক সেতুবন্ধন হিসেবে দেখাই যথার্থ।[17]

২. ভাষাগত ব্যবধান: শব্দের সীমা ও অর্থের অতলতা

আরবি ভাষা তার নিজস্ব ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ এবং শব্দার্থের গভীরতার দিক থেকে অতুলনীয়। এর শব্দভাণ্ডার যেমন বিশাল, তেমনি প্রতিটি শব্দের রয়েছে ধাতুগত উৎস এবং প্রসঙ্গের ওপর নির্ভর করে বহুবিধ অর্থ ধারণের ক্ষমতা। একটি শব্দ বিভিন্ন বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন সূক্ষ্ম দ্যোতনা বহন করতে পারে। বাংলা বা ইংরেজির মতো (ইন্দো-ইউরোপীয়) ভিন্ন ভাষা-পরিবারের ভাষায় এই গভীরতা ও ব্যাপকতাকে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

উদাহরণস্বরূপ, রব, তাকওয়া, ইবাদাহ, দ্বীন, সবর, ইহসান, জিহাদ, ফিতনা, বারাকাহ—এইসব শব্দের সরল বা একমাত্রিক অনুবাদ মূল অর্থের বিশালতাকে সংকীর্ণ করে দেয়। এমনকি আল্লাহ শব্দের কোনো যথার্থ বিকল্প বা প্রতিশব্দ অন্য কোনো ভাষায় পাওয়া সম্ভব নয়।[18] ফলে অনুবাদকদের অনেক সময় মূল

---

[17] Suyuti, Jalaluddin. *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an.*

[18] 'আল্লাহ': এ শব্দের কোনো লিঙ্গ বা বচন নেই—এটি তাঁর সুনির্দিষ্ট নাম।

'রব': এ শব্দের মধ্যে প্রতিপালক, প্রভু, মালিক, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, ব্যবস্থাপক এবং ক্রমবিকাশদানকারী—এই সমস্ত ধারণা অন্তর্ভুক্ত।

'দ্বীন': অর্থ কেবল বিধান নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা এবং আনুগত্যের বিধান।

আরবি শব্দটিকে রেখে পাশে টীকা সংযোজন করতে হয়। তবুও, কুরআনের শব্দের প্রকৃত স্বাদ এবং হৃদয়ের গভীরে তার অনুধাবন একমাত্র আরবি ভাষার সংস্পর্শেই পূর্ণতা লাভ করে।

৩. সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের গুরুত্ব

কুরআনের বহু আয়াত নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সপ্তম শতাব্দীর আরব সমাজ, প্রাক-ইসলামী সংস্কৃতি, গোত্রীয় জীবন এবং তৎকালীন রীতিনীতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। উম্মুল মু'মিনীন, সাহাবায়ে কিরামের জীবন, আসবাবুন নুযুল (আয়াত নাজিল হওয়ার প্রেক্ষাপট) এবং নবীজির যুগের বাস্তবতা অনুধাবন না করলে বহু আয়াতের সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করা অসম্ভব।

একজন অনুবাদক যদি আরবের ইতিহাস, সীরাত এবং আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হন, তবে তার অনুবাদ হয় অসম্পূর্ণ থাকবে, নয়তো বিভ্রান্তির জন্ম দিতে পারে। সঠিক পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞান অনুবাদের নির্ভুলতার জন্য অপরিহার্য।

'ইবাদাত': অর্থ শুধু আনুষ্ঠানিক উপাসনা নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব ও শর্তহীন আনুগত্য।

'তাকওয়া': অর্থ কেবল আল্লাহভীতি নয়, বরং আত্মরক্ষা, সকল প্রকার পাপ ও আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ থেকে সতর্কতা অবলম্বন এবং কর্তব্যপরায়ণতা।

'জিহাদ': অর্থ কেবল সশস্ত্র যুদ্ধ নয়, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম—যা শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক যেকোনো রূপ নিতে পারে।

'সবর': অর্থ নিছক ধৈর্যধারণ নয়, আল্লাহর সিদ্ধান্তে অবিচল থাকা, সহিষ্ণুতা এবং অধঃপতন থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

'ইহসান': অর্থ কেবল সৌন্দর্য বা দয়া নয়, বরং কর্মে উৎকৃষ্টতা অর্জন এবং সর্বোত্তম সম্ভাব্য উপায়ে তা সম্পাদন করা।

'ফিতনা': এর অর্থে পরীক্ষা, প্রলোভন, বিশৃঙ্খলা এবং উৎপীড়ন—সবই বিদ্যমান।

'বারাকাহ': এর মাধ্যমে কল্যাণ, প্রবৃদ্ধি, প্রাচুর্য এবং আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ বোঝানো হয়।

৪. রূপকতা, বহুবিধ অর্থ ও তাফসির-নির্ভরতা

কুরআনে এমন অনেক শব্দ বা বাক্যাংশ রয়েছে, যা একাধিক অর্থবোধক (যুল-উজুহ)। এবং এমন অনেক আয়াত রয়েছে রয়েছে, যার বাহ্যিক অর্থ সুস্পষ্ট নয় বা যার প্রকৃত মর্ম আল্লাহই ভালো জানেন, অথবা যা রূপক ব্যাখ্যাসাপেক্ষ (মুতাশাবিহাত)।

এইসব ক্ষেত্রে আয়াতের গভীর অর্থ অনুধাবন এবং সঠিক অর্থটি নির্ণয়ের জন্য অনুবাদককে অত্যন্ত সতর্কতা ও প্রজ্ঞার সাথে একাধিক বিষয় বিবেচনা করতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে—আয়াতের পূর্বাপর প্রসঙ্গ (সিয়াক-সাবাক), নাযিলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (আসবাবুন নুযুল), সংশ্লিষ্ট বিশুদ্ধ হাদিসের ব্যাখ্যা, সাহাবী ও তাবেঈনদের নির্ভরযোগ্য মতামত এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উম্মাহর বিজ্ঞ ও স্বীকৃত মুফাসসিরগণের মূল্যবান বিশ্লেষণ। এই সমস্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত ব্যাখ্যা ও মতামতের আলোকে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক, গ্রহণযোগ্য ও নিরাপদ অর্থটি নির্বাচন করাই অনুবাদকের দায়িত্ব। অর্থ নির্ণয় ও নির্বাচনের এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল এবং স্বাভাবিকভাবেই এতে মুফাসসির ও অনুবাদকদের মধ্যে মতপার্থক্যের অবকাশ থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, 'কুরু' শব্দটি আরবিতে একই সাথে ঋতুস্রাব এবং পবিত্রতা—উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। আবার 'ওয়া আনতুম সামিদুন' বাক্যাংশটি উদাসীন থাকা বা গান-বাজনায় মত্ত থাকার মতো ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হতে পারে।

আরও জটিলতা দেখা দেয় আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায়, যেমন 'ইয়াদুল্লাহ' (আল্লাহর হাত), 'ওয়াজহুল্লাহ' (আল্লাহর চেহারা) অথবা 'ইসতাওয়া আলাল আরশ' (আরশে সমাসীন হওয়া)। এইসব আয়াতের সালাফি চিন্তাধারার আলিমগণের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ বনাম ক্লাসিক্যাল সুন্নি ধারার আশআরী ও মাতুরিদি আলেমগণের রূপক বা ব্যাখ্যামূলক অর্থ গ্রহণ নিয়ে ইসলামে দীর্ঘদিনের ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক বিদ্যমান।

এই গভীর ধর্মতাত্ত্বিক মতপার্থক্য অনুবাদের শব্দচয়ন এবং আয়াতের ব্যাখ্যা উপস্থাপনের ধরনে সরাসরি ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

এখানেই অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকারকের দীনী দায়বদ্ধতা, প্রজ্ঞা এবং ভাষাগত দক্ষতার সর্বোচ্চ পরীক্ষা হয়। নির্ভরযোগ্য তাফসির গ্রন্থের সহায়তা ছাড়া এসব আয়াতের অনুবাদ বিভ্রান্তিকর হতে পারে।

৫. ফিকহি মতপার্থক্য ও মাযহাবিক প্রবণতা

ইসলামের বিভিন্ন ফিকহি ও আকিদাগত ধারার অনুসারীদের মধ্যে বহু আয়াত বা শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান। বিভিন্ন মাযহাব (যেমন হানাফি, শাফিঈ) বা আকিদাগত চিন্তা (যেমন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, সালাফি, শিয়া, সুফি) অনুযায়ী একই আয়াতের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেখা যায়।

একজন অনুবাদক যদি তার ব্যক্তিগত বা মাযহাবগত প্রবণতা সম্পর্কে সচেতন না হন, তবে তার অনুবাদে সেই পক্ষপাতীত্ব চলে আসতে পারে। কেউ হয়তো রূপক ব্যাখ্যার দিকে ঝুঁকবেন, আবার কেউ আক্ষরিক অনুবাদকে প্রাধান্য দেবেন। আদর্শ অনুবাদক হতে হলে তাকে হতে হবে নির্মোহ, নিরপেক্ষ এবং সমস্ত স্বীকৃত দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান জানানো একজন আমানতদার গবেষক।

৬. অনুবাদকের যোগ্যতা

পবিত্র কুরআনের একজন বিশ্বস্ত অনুবাদকের কেবল ভাষার ওপর গভীর দখল থাকলেই চলে না। তাকে কুরআনিক বিজ্ঞান, হাদীস, ফিকহ, আকীদা, উসূলুল ফিকহ, উসূলুত তাফসির, আরবি সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র, আরব ইতিহাস ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হয়।

এর বাইরেও প্রয়োজন হয় ব্যক্তিগত গুণাবলীর—তাকওয়া, সততা, নিরপেক্ষতা, আল্লাহভীতি এবং গভীর দীনী দায়িত্ববোধ। কারণ, পবিত্র কুরআনের অনুবাদ নিছক কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক বা ভাষাগত অনুশীলন নয়; এ এক পবিত্র আমানত, যা বহন করার জন্য জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আমলের সমন্বয়

অপরিহার্য।

৭. অনুবাদ কি কুরআন?—একটি মৌলিক প্রশ্ন

এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন, যার গভীর ধর্মতাত্ত্বিক তাৎপর্য রয়েছে। মুসলিম আলিমদের সর্বসম্মত অভিমত হলো, কুরআনের কোনো অনুবাদই মূল কুরআনের মর্যাদা বহন করে না। কুরআন হলো আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ আরবি ভাষার মোবারক কিতাব। অনুবাদ হলো সেই মূলের একটি মানবিক প্রচেষ্টা—তাফসিরের একটি রূপ, যা মানুষের নিজস্ব উপলব্ধি, সীমিত ভাষাগত ক্ষমতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে গঠিত।

এই কারণেই সালাত বা অন্য যেকোনো ইবাদতে কুরআনের আরবি মূল পাঠই আবশ্যক। তবে ইসলামের বাণীকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে এবং কুরআনের অর্থ ও শিক্ষাকে সহজলভ্য করতে অনুবাদের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি জ্ঞানার্জন ও গবেষণার এক শক্তিশালী মাধ্যম।

পবিত্র কুরআনের অনুবাদ একদিকে যেমন এক মহৎ সেবা, তেমনি এটি প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা এবং গভীর দায়িত্ববোধের পরিচায়ক। এই কাজে হাত দিয়ে অনুবাদক একদিকে যেমন ভাষার কারিগর, তেমনি তিনি আল্লাহর বাণীর এক ক্ষুদ্র আমানতদার। এই গুরুদায়িত্ব তার থেকে চায় সর্বোচ্চ সততা, তাকওয়া, প্রজ্ঞা এবং নিরলস সাধনা। আর পাঠকের দায়িত্ব হলো—অনুবাদকে কখনোই মূল সত্তা হিসেবে না দেখে, বরং মূল কুরআনের অর্থ ও রূহের গভীরে প্রবেশের একটি সহায়ক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা, এবং প্রয়োজনে নির্ভরযোগ্য তাফসির, হাদীস ও মূল আরবির ভাষাগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে কুরআনের আসল রূহ্ উপলব্ধি করার চেষ্টা করা।

উপসংহার

পবিত্র কুরআনের কালজয়ী, শাশ্বত ও সার্বজনীন বাণীকে ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত সীমার ঊর্ধ্বে তুলে ধরে সমগ্র মানবজাতির নিকট পৌঁছে

দেওয়ার এক মহত্তম প্রচেষ্টা হলো ‘কুরআনের অনুবাদকর্ম’। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে সাহাবি সালমান আল-ফারসি রা. কর্তৃক সূরা ফাতিহার আংশিক ফারসি অনুবাদ ছিল এ প্রয়াসের সূচনা। আর একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল যুগে দাঁড়িয়ে বহুভাষিক অনুবাদ ও তাফসিরের বিস্তৃত ও সহজপ্রাপ্য রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরেছে এই অভিযাত্রার এক বিস্ময়কর ইতিহাস।

এই দীর্ঘ পথে যেমন প্রতিফলিত হয়েছে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিবেদিতপ্রাণ বহু আলেম ও অনুবাদকের নিরলস সাধনা, তেমনি দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব এবং ব্যাখ্যাগত জটিলতার নানা অধ্যায়। রবার্ট অফ কেটনের পক্ষপাতদুষ্ট ল্যাটিন অনুবাদ থেকে শুরু করে জর্জ সেলের প্রভাবশালী ইংরেজি সংস্করণ, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর যুগান্তকারী ফারসি ব্যাখ্যা এবং তাঁর পুত্রদের প্রাঞ্জল উর্দু অনুবাদ—সবকিছুই এই ধারার অংশ। বাংলা ভাষায় গিরিশচন্দ্র সেনের সাহসী পথচলা, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ অসংখ্য আলেম ও গবেষকের নিরলস প্রচেষ্টা এই ঐতিহ্যকে করেছে সমৃদ্ধ, সংহত ও ধারাবাহিক।

তবে অনস্বীকার্য যে, কুরআনের আরবি মূল পাঠের ভাবগাম্ভীর্য, অলৌকিক ভাষাশৈলী, গভীর অর্থবহতা ও আধ্যাত্মিক অনুরণন কোনো অনুবাদেই পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয় না। অনুবাদ মূলত একটি ব্যাখ্যা—মানবীয় উপলব্ধি, ভাষাগত সীমাবদ্ধতা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন।এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অনুবাদ কুরআনের নির্দেশনা, হেদায়েত ও অনুপম সৌন্দর্যকে বিশ্বের নানা প্রান্তে কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক অপরিহার্য ও কার্যকর মাধ্যম হিসেবে ইতোমধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কুরআনের অনুবাদকর্ম ব্যক্তিজীবনে আত্মশুদ্ধি, জ্ঞানার্জন ও নৈতিক গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখার পাশাপাশি, বৈশ্বিক পরিসরে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের চর্চাকে করেছে গতিশীল।

একইসাথে এটি মুসলিম উম্মাহর নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবেও কাজ করছে।

বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদের ধারা এখন আর কেবল কয়েকজন সাহসী পুরোধা ব্যক্তিত্বের নিঃসঙ্গ সাধনায় সীমাবদ্ধ নেই; বরং এটি হয়ে উঠেছে এক বহুমাত্রিক ও সমন্বিত জ্ঞানপ্রবাহ—যা অতীতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে পাথেয় করে, বর্তমানের চ্যালেঞ্জকে সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করে এবং ভবিষ্যতের পথে আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে চলেছে।

আমরা প্রার্থনা করি, আধুনিক প্রযুক্তি, ভাষাবিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব ও ব্যাখ্যাশাস্ত্রের সমন্বয়ে এই অনুবাদচর্চা আগামীতেও আরও বিশ্লেষণসমৃদ্ধ, নির্ভুল, শৈল্পিক ও জ্ঞাননির্ভর রূপ লাভ করুক।

গ্রন্থপ্রঞ্জি:

1. Al-Dhahabi, Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad, *Siyar A'lam al-Nubala'*
2. Ibn Hisham, 'Abd al-Malik, *Sirat Rasul Allah*
3. Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir, *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk*
4. Ibn Hajar al-'Asqalani, Ahmad ibn 'Ali, *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*
5. Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, *Sahih al-Bukhari*
6. Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*
7. Al-Suyuti, Jalal al-Din, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*
8. Hamidullah, Muhammad. *The Life and Work of the Prophet of Islam.* Islamabad: Islamic Research Institute, 1998.
9. Lings, Martin. *Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources.* London: Islamic Texts Society, 1983.
10. Arberry, A. J. *The Koran Interpreted.* London: George Allen & Unwin, 1955.
11. Abdel Haleem, M. A. S. *The Qur'an: A New Translation.* Oxford: Oxford University Press, 2004.
12. Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an.* Chicago: University of Chicago Press, 1980.
13. McAuliffe, Jane Dammen, ed. *Encyclopaedia of the Qur'an.* Leiden: Brill, 2006.
14. Rippin, Andrew, ed. *The Blackwell Companion to the Qur'an.* Oxford: Blackwell Publishing, 2006.
15. Kritzeck, James. *Peter the Venerable and Islam.* Princeton: Princeton University Press, 1964.
16. Daniel, Norman. *Islam and the West: The Making of an Image.* Oxford: Oneworld Publications, 1993 (reprint).

17. Burman, Thomas E. *Reading the Qur'an in Latin Christendom, 1140–1560.* Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007.

18. Hamilton, Alastair. *The Forbidden Fruit: The Impact of the Qur'an in Reformation Europe.* London: Gingko Library, 2018.

19. Ross, Alexander (trans.). *The Alcoran of Mahomet.* London, 1649.

20. Sale, George (trans.). *The Koran.* London, 1734.

21. Frye, R. N., ed. *The Cambridge History of Iran, Vol. 4: The Period from the Arab Invasion to the Saljuqs.* Cambridge: Cambridge University Press, 1975.

22. Bosworth, C. E. *The New Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Manual.* Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996.

23. Meisami, Julie Scott. *Persian Historiography to the End of the Twelfth Century.* Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999.

24. Arjomand, Said Amir. *The Shadow of God and the Hidden Imam: Religion, Political Order, and Societal Change in Shi'ite Iran from the Beginning to 1890.* Chicago: University of Chicago Press, 1984.

25. Hermansen, Marcia K. *Shah Wali Allah of Delhi's Hujjat Allah al-Baligha.* Louisville, KY: Fons Vitae, 2014.

26. Powell, Avril A. *Muslims and Missionaries in Pre-Mutiny India.* London: Routledge, 1993.

27. Abbas, Zaheer. *Construction of Bengali Muslim Identity in Colonial Bengal, c. 1870–1920.* Master's Thesis, University of North Carolina at Chapel Hill, Department of History, 2010.

28. De, Amalendu. "The Social Thoughts and Consciousness of the Bengali Muslims in the Colonial Period." *Social Scientist* 23, no. 4/6 (1995): 16–31.

29. Wilson, M. Brett. "The First Translations of the Qurʾan in Modern Turkey (1924–38)." *International Journal of Middle East Studies* 41, no. 3 (2009): 419–435.

30. Findley, Carter V. *Turkey, Islam, Nationalism, and Modernity: A History, 1789–2007.* New Haven: Yale University Press, 2010.

31. Hughes, Micah. “Making the Qur᾽an Turkish: Translation and Power in the Ottoman Empire.” *The Marginalia Review of Books*, 2016.

32. Wilson, M. Brett. *The Qur'an after Babel: Translating and Printing the Qur'an in Late Ottoman and Modern Turkey*. PhD diss., Duke University, 2009.

33. রহমান, ড. মুহাম্মদ মুজীবুর। *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা*। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

34. হাননান, ড. মোহাম্মদ। *পবিত্র কোরআন বাংলা অনুবাদের ইতিহাস ও তুলনামূলক আলোচনা*। আগামী প্রকাশনী।